রমেশচন্দ্র দত্ত



ভট্টাচার্য্য গ্রন্থ সভা



তিন-আনা-সংস্করণ "কল্পতরু" গ্রন্থাবলী নং ৮

বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য
নির্দ্ধারিত (কলিকাতা গেজেট, ২০শে আগষ্ট ১৯২০)

রমেশচন্দ্র দত্ত

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime."

বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজা রামমোহন,
কেশবচন্দ্র, ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

১৯২১

মূল্য তিন আনা

কলিকাতা
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং
৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রমেশচন্দ্র দত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

গাছের তলায় বসিয়া কেবল উপরের দিকে চাহিয়া থাকিলে যেমন ফল পাড়া যায় না, চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গাছে উঠিয়া পাড়িয়া আনিতে হয়—তেমনি এ সংসারে বড় হইবার আশা করিয়া শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কিছুই হয় না, প্রাণপণ চেষ্টায় ঐকান্তিক সাধনা করিতে হয়।

যিনি চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা প্রভৃতির বলে দিবারাত্র ঐকান্তিক মনপ্রাণে যে কোন বিষয়ে সাধনা করিতে পারেন, তিনি যে পরিণামে সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া দেশবিখ্যাত হইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি এবং অমর নাম রাখিয়া যাইতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত সকল দেশের ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের এ দেশেও যাহারা ঐরূপ সাধনাদ্বারা বড় হইয়া দেবতার মত, সকল লোকের ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন মহাত্মা রমেশচন্দ্রও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

পূর্ব্বকালে এদেশে অনেক ধর্ম্মপরায়ণ বড়লোক দান, ধ্যান, আতিথেয়তা, দেশ-হিতৈষিতা প্রভৃতি গুণে দেশবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। ইংরাজ-শাসনের প্রথম সময়ে কলিকাতার রামবাগানের দত্ত-বংশও তেমনি নানাবিধ সৎকার্য্য এবং মহত্ত্বের জন্য

দেশের সকলের কাছে পরম শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। এই মহাসম্ভ্রান্ত দত্ত-বংশেই রমেশচন্দ্রের জন্ম।

তখনকার কালে যাঁহারা দেশের মধ্যে নামজাদা হইয়া উঠিতেন, এখানকার ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা অবধি তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে ব্যস্ত হইতেন। কারণ তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের সহায়তায় ইংরাজরাজ এ দেশের লোকের ভিতরকার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিতেন, তাহাতে দেশের উন্নতির জন্য নানা প্রকারের সৎকার্য্য করিবার সুবিধা হইত। এইরূপে সে সময়ে দত্ত-বংশের সহিত ইংরাজ-রাজপুরুষদের এবং রাজা নন্দকুমার, নবকৃষ্ণ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণের বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়া উঠিয়াছিল।

এ দেশে ইংরাজ-শাসনের সেই প্রথম সময়ে এই দত্তবংশের কর্ত্তা ছিলেন নীলমণি দত্ত। তিনি নিজের চরিত্র এবং মহত্ত্বগুণে দেশের ইতর ভদ্র সকলের নিকটই যেমন শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখনকার রাজপুরুষগণেরও তেমনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। এমন কোন সৎকার্য্য ছিল না যাহাতে তাঁহার নাম জড়িত না থাকিত।

তিনি পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু—প্রত্যহ গঙ্গাস্নান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এমন কোন পূজা-আর্চ্চা ছিল না, যাহা তিনি ভক্তিভরে সম্পন্ন না করিতেন এবং এমন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং দীন-দুঃখীও ছিল না—যাহারা তাঁহার দান পাইয়া ধন্য না হইয়াছে। এইরূপে 'নীলু দত্ত' এর নাম দেশের সকল লোকের মুখেই জপমালার মত ফিরিত।

পরম নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু হইলেও, তিনি এমন উদারচরিত্র ও প্রকৃত ধার্ম্মিক ছিলেন যে অন্য কোন ধর্ম্মকে ঘৃণা বা উপেক্ষা করিতেন না। যে কোন ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী লোক আসুন না কেন, নীলু দত্ত তাঁহাদের সকলকেই পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন এবং

সকল ধর্ম্মই সত্য বলিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করিতেন। এই কারণে তখনকার অনেক পাদরী সাহেবদের সঙ্গেও তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

ইংরাজ-রাজপুরুষ এবং পাদরী সাহেবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে সেই সময় হইতেই এই বংশে ইংরাজী পড়াশুনার বিশেষ চেষ্টা ও আদর আরম্ভ হইয়াছিল এবং এদেশে তখন এরূপ ইংরাজী শিক্ষা লাভের সুবিধা না থাকিলেও তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরেরা সকলেই ইংরাজীতে পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নদীতে নূতন বান আসিলে যেমন কিছু না কিছু ভাসাইয়া না লইয়া গিয়া ছাড়ে না—তেমনি সেইকালে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে খৃষ্টধর্ম্মের যে বান আসিয়া লাগিয়াছিল—তাহার প্রবল ঢেউয়ে অনেক হিন্দুসংসার ভাসিয়া গিয়াছিল। অনেক গোঁড়া হিন্দুর বংশধর বিশেষরূপ লেখাপড়া শিখিয়া পরম পণ্ডিত হইয়াও নূতন খৃষ্টধর্ম্মের প্রবল আকর্ষণ কাটাইতে পারেন নাই। বরং ইংরাজী ভাষায় যাঁহারা বিশেষ রকম কৃতবিদ্য হইয়া দেশের গৌরবের বস্তু হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই এই ধর্ম্মের আকর্ষণ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

তেমনি, সেই রামবাগানের দত্তবংশের মধ্যে নীলুদত্তের মৃত্যুর পরে ইংরাজী শিক্ষা যত বেশী আরম্ভ হইতে লাগিল, তাঁহার বংশধরেরা ইংরাজিতে পরম পণ্ডিত হইয়া যতই দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং গৌরবের বস্তু হইয়া উঠিতে লাগিলেন, ততই তাঁহারা যেমন রাজ-পুরুষদের প্রিয়পাত্র হইয়া বড় বড় উচ্চ এবং সম্ভ্রমের চাকরি পাইতে লাগিলেন, তেমনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের টানও দিন দিন ততই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে হিন্দু-চূড়ামণি নীলুদত্তের বংশধরেরা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টিয়ান হইলেন।

কিন্তু বিদ্যার এমনি গৌরব, লেখাপড়া শিক্ষার এতই গুণ, পাণ্ডিত্যের এত প্রভাব ও সম্মান যে খৃষ্টিয়ান হইয়াও তাঁহারা লোক-সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় হইলেন না। বিদ্যা উপার্জ্জনের মহিমায় তাঁহারা দেশের মধ্যে যেমন উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তেমনি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত খৃষ্টিয়ান বংশ হইয়া রহিলেন। বংশের সকলেই পরম বিদ্বান্, সুতরাং গবর্ণমেণ্টও গুণের গৌরব রক্ষা করিয়া তাঁহাদের সকলকেই বড় বড় চাকরি দিয়া সম্মান বাড়াইতে লাগিলেন: ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার প্রভৃতি হইয়া তাঁহারা দেশের ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করিলেন।

এই নীলুদত্তের পৌত্র ঈশানচন্দ্র এবং তাঁহার ভ্রাতারাও পিতা, পিতামহদের মত সম্ভ্রান্ত ও দেশবিখ্যাত ব্যক্তি হইয়া দেশের ইতিহাসে নিজেদের নাম গৌরবে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই পরম বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র এবং মহৎ ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত। এমন কি এই বংশের মেয়েরা পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়া পুরুষদের মত কীর্ত্তিলাভ করিয়া সুদূর বিলাতবাসীদের কাছে পর্য্যন্ত নাম রাখিয়া গিয়াছেন

আজকাল এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার যেরূপ বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে, তখনকার কালে তাহার কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও এই দত্তবংশের এক কন্যা 'তরুদত্ত' নিজের 'অদ্ভুত শক্তি ও চেষ্টার বলে অল্প বয়সের মধ্যেই ইংরাজী ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় এমন পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে সেই সকল বিদেশীভাষায় পুস্তক লিখিয়া, কবিতা রচনা করিয়া এদেশবাসিগণকে যেমন অবাক করিয়া দিয়াছিলেন— বিলাতের লোকের কাছেও তেমনি অশেষ ভক্তি ও সম্মান লাভ করিয়া সরস্বতীর মত পূজিত হইয়া গিয়াছেন। এই স্বনামখ্যাত বঙ্গবালা তরুদত্ত এবং রমেশচন্দ্র খুড়তুতো-জ্যেঠতুতো ভাই বোন।

এই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া, দেশের লোক বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছিল, সকলেই একবাক্যে বলিত যে লক্ষ্মী-সরস্বতী তাঁহাদের

চিরদিনের বিবাদ ভুলিয়া রামবাগানের দত্তবংশে একসঙ্গে বিরাজ করিতেছেন।

নীলমণি দত্তের তিনটি পুত্র—তিনজনের প্রত্যেকেই এক একটী রত্ন বলিলেও হয়। লোকে বলে 'গাছ ভাল হইলেই ফলও ভাল হইয়া থাকে', একথা অক্ষরে অক্ষরে দত্তবংশে সত্য হইয়াছিল।

এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্বগুণের আধারস্বরূপ ছিলেন—নীলমণি দত্তের পুত্রেরাও তেমনি তাঁহাদের সকল গুণেরই ভাগ পাইয়াছিলেন। বিশেষ তাহার উপর উচ্চশিক্ষিত হইয়া সকলেই পূর্ব্বপুরুষের নাম আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন।

নীলুদত্তের তিনটি পুত্রের মধ্যে যিনি সকলের ছোট, তাঁহার নাম—পীতাম্বর। এই পীতাম্বর দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ঈশানচন্দ্র এবং কনিষ্ঠের নাম শশীচন্দ্র।

ঈশানচন্দ্র এবং শশীচন্দ্র দুই ভ্রাতাই বাল্যকালে কলিকাতার হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করিয়া পরম বিদ্বান ও জ্ঞানী হইয়া উঠেন। সেই বাল্যকাল হইতেই দুই ভ্রাতার অন্তরে সাহিত্যচর্চ্চা করিবার প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠে এবং কলেজে পড়িবার সময় হইতেই সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা মনপ্রাণ অর্পণ করেন। সেই সময়ে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে 'হিন্দু-বার্ত্তাবহ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়—ঈশানচন্দ্রই ইহার একজন প্রধান নেতা ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

তারপর ঈশানচন্দ্র হিন্দুকলেজের পড়াশুনা শেষ করিয়া কলিকাতার মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং ইংরেজী ১৮৩৭ সালের মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রশংসা ও গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া একখানি স্বর্ণপদক পাইলেন।

তখনকার দেশবিখ্যাত ডাক্তার 'গুড্‌ইভ চক্রবর্ত্তী' ঈশানচন্দ্রের গুণগ্রাম দেখিয়া এমন বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি

ঈশানচন্দ্রকে বিলাতে পাঠাইয়া আরও উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে ঈশানচন্দ্রের আর বিলাতে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

সেই সময়ে কলিকাতায় ভয়ানক মারীভয় আরম্ভ হইল। ভীষণ 'কলেরা' রোগে প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি মরিতে লাগিল, পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে রোদনের রোল উঠিল। তখনকার বড় বড় ডাক্তারেরা এবং গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও শীঘ্র কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

সেই মারীভয়ের কালে মহাত্মা ঈশানচন্দ্র তাহার প্রতিকারের জন্য নিস্বার্থভাবে দিবারাত্রি যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম অতি শীঘ্রই দেশ জুড়িয়া রাষ্ট্র হইয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরও ঈশানচন্দ্রের উপর বড়ই প্রীত হইলেন এবং অবিলম্বে ডেপুটি কালেক্‌টারের পদে নিয়োগ করিয়া তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন।

ঈশানচন্দ্রের গুণে এবং কার্য্যদক্ষতায় গবর্ণমেণ্ট এত সন্তুষ্ট হইলেন যে তখনকার ছোটলাট বাহাদুর স্যর্ ফ্রেড্‌রিক হ্যালিডে মহোদয় মুর্শিদাবাদে দরবার করিবার সময়ে—সেই দরবারে তাঁহাকে ডাকাইয়া স্বয়ং তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইলেন না।

একুশ বৎসর বয়সে ঈশানচন্দ্রের বিবাহ হইল এবং যথাসময়ে তাঁহাদের চারিটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেশচন্দ্রের জন্মের বৎসর খানেক পরে ইংরাজী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে স্বনামধন্য কর্ম্মবীর মহাত্মা রমেশচন্দ্র মায়ের কোল আলো করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সঙ্গগুণে মানুষের স্বভাব ভাল বা মন্দ হইয়া থাকে। সেই জন্য বাল্যকাল হইতে পিতামাতা এবং অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের সৎসঙ্গে রাখিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। রমেশচন্দ্রের বাল্যকালও সেইরূপ সৎসঙ্গের মধ্যে থাকিয়া গঠিত হইতে লাগিল।

রমেশচন্দ্রের পিতামাতা জ্যাঠা-খুড়া সকলেই বিদ্বান্, সকলেই উন্নত চরিত্র, সকলেই ন্যায়-ধর্ম্মপরায়ণ, সকলেই সাহিত্যপ্রিয়। বিশেষতঃ তাঁহার পিতা ঈশানচন্দ্র অত্যন্ত পরিশ্রমী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাশালী, সত্য এবং ন্যায়বান, আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি ছিলেন। বাল্যকাল হইতে দেখিয়া দেখিয়া বালকের চরিত্রও সেই সকল গুণরাশিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

রমেশচন্দ্রের বয়স যখন চারি বৎসর এবং তাঁহার দাদা যোগেশ-চন্দ্রের বয়স পাঁচ বৎসর, তখন দুইভাইয়েরই একসঙ্গে হাতে-খড়ি হইল। দুইজনেই পাড়ার একটা পাঠশালায় লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। তখনকার নিয়ম ছিল যে প্রথমে তালপাতা এবং তারপরে কলাপাতায় লিখিয়া লেখা শিখিতে হইত। দুইভাই সেই নিয়ম অনুসারে তালপাতা এবং কলাপাতার লেখা শেষ করিলেন।

চারবছর বয়সের বালক রমেশচন্দ্র লেখা গুলাকে ছবির মত ভাবিয়া এমন শীঘ্র শীঘ্র সেগুলি সুন্দররূপে শিখিয়া ফেলিলেন যে তাহাতে একটুও কষ্ট বোধ করিলেন না—বরং যেন ভারি একটা আমোদের কাজের মত সেগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া তাহার ভিতরে মগ্ন হইয়া রহিলেন।

পাঠশালার পড়া শেষ হইলে দুইভাই প্রথমে একটা বাংলা

স্কুলে এবং তারপরে কলিকাতার হেয়ার স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

পিতা ঈশানচন্দ্র—ডেপুটি কালেক্টার, তিনি বাড়ীতে থাকিতে পারেন না—কার্য্য উপলক্ষ্যে তাঁহাকে বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, সুতরাং বাল্যকাল হইতেই যে পুত্রগণকে আপনার কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবেন তাহার উপায় ছিল না এবং অত ছোট ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বিদেশে বিদেশে ঘুরিলে তাহাদের পড়াশুনাতেও বিশেষ ব্যাঁঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। সেইজন্য হাতে-খড়ির পর হইতেই পুত্রগণকে একজন পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্যের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া বাড়ীতে রাখিয়া যাইতেই বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ভৃত্যটির নাম যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির যোগেশচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রকে বুকের পাঁজরার মত দেখিত, সমস্ত প্রাণটুকু দিয়া সর্ব্বদা আড়াল করিয়া ঘিরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। নিজে সঙ্গে করিয়া পাঠশালায় লইয়া যাইত এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সারাদিন পাঠশালায় বসিয়া থাকিয়া তাঁহাদের মত তালপাতায় হাতের লেখা লিখিত। পাঠশালার ছুটী হইলে অন্য বালক-দের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ দিত না—নিজেই সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিত এবং সঙ্গে সঙ্গে অষ্টপ্রহর থাকিয়া খেলা-ধূলা করিত।

এইরূপে পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া যখন বালকেরা একটু বড় হইয়া স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন আর ততটা অষ্টপ্রহর আগলাইয়া বেড়াইবার আবশ্যক না থাকিলেও সে তাঁহাদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিত।

কিন্তু পাঠশালা ছাড়িবার পর এই স্কুলে বালক দু'জনকে বরাবর পড়িতে হইল না। পিতা তখন পুত্রদের প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে করিয়া রাখিতে লাগিলেন। যখন যে দেশে তিনি বদলী হইয়া যাইতেন, ছেলেদেরও লইয়া গিয়া সেইখানকার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিতেন।

আবার মাঝে মাঝে বাড়ী আসিয়া ছেলেরা পুনরায় কলিকাতার ইস্কুলে ভর্ত্তি হইত।

উপরক্লাসে উঠিয়া পরীক্ষার পড়ার সময় হইলে হয়ত এরূপ ভাবে নানা স্থানের নানা স্কুল বদল করিয়া বেড়াইলে পড়ার ক্ষতি হইতে পারিত, কিন্তু তখন বালক দুইজনই ছোট, নীচের ক্লাসের কম পড়া পড়েন। সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি না হইয়া বরং লেখাপড়ার আরও উন্নতি হইতে লাগিল এবং স্বভাবচরিত্রও উত্তমরূপে গঠিত হইবার সুযোগ হইল।

বরাবর এক জায়গায় একই স্কুলে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে গেলে, যতই চোখে-চোখে রাখা হউক না কেন, ছেলেরা একটা না একটা দলে ভিড়িবার অনেক সুযোগ পায় এবং ভালর চেয়ে মন্দটার আকর্ষণ বেশী বলিয়াই অনেকে কুসংসর্গে মিশিয়া নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই সেইরূপ একস্থানে থাকিতে না পারিয়া নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য--বালক দু'জনের ভাল কি মন্দ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট দলে মিশিবার সুযোগ রহিল না, সুতরাং তাঁহারা আপনাদের ঘরের মধ্যেই বাপ-মা' ভাই-বোনদের সঙ্গে সঙ্গে অনবরত থাকিয়া সৎদৃষ্টান্ত এবং সদুপদেশের দ্বারা গঠিত হইতে লাগিলেন। ইহার পরিণাম ভাল না হইবে কেন?

তাহা ছাড়া নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবারও একটা অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও ফল আছে, বাল্যকাল হইতেই সে সকল তাঁহাদের সহজেই লাভ হইতে লাগিল। বিশেষ তখনকার দিনে এখনকার মত চারিদিকে এত গাড়ী ঘোড়া, রেলওয়ে, ষ্টীমারের ছড়াছড়ি ছিল না। যেখানেই যাও না কেন—হয় হাঁটাপথ, কিম্বা নৌকা, কিম্বা পাল্‌কী, কিম্বা বড়জোর গরুর গাড়ী ভিন্ন আর অন্য উপায় ছিল না, সুতরাং যথার্থ দেশভ্রমণের যা কিছু ফল, তা তখনকার দিনেই পাওয়া যাইত।

এখন যত দূর দেশেই যাইতে ইচ্ছা হউক না কেন—রেল বা

ষ্টীমারে চড়িয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিলেই অতি শীঘ্র সেখানে গিয়া পৌছাইতে পারা যায়। ইহাতে পথের দুইধারে যা কিছু বাঁধা-ধরা দেখিবার মত দৃশ্য বা জিনিষ আছে—তা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং দেশভ্রমণের যা কিছু কঠোরতা, যা কিছু অভিজ্ঞতা, যা কিছু জ্ঞান,যা কিছু শিক্ষা আছে—সে সকলের কিছুই পাওয়া যায় না।

কিন্তু তখনকার কালে হাঁটাপথে, নৌকায় কি পাল্‌কীতে কোন একটা দেশে যাইতে হইলে পথের মধ্যে যেখানে যা কিছু দেখিবার, শুনিবার, শিখিবার মত আছে, সে সকলই দেখাশুনা ও শিখিবার সুযোগ পাওয়া যাইত। নানা স্থানের নানা প্রকার গ্রাম, নগর, মনুষ্য, দেবালয়, নদী, পাহাড়, প্রস্তর, খাল, বিলের মধ্য দিয়া বিশ্রাম করিয়া করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে, কত বিপদে পড়িতে হইত, কত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিত, কত রকম মানুষের সংশ্রবে আসিতে হইত, কত রকমের কত দৃশ্য নজরে পড়িত, কত স্থানের কত গল্প, কত বৃত্তান্ত, কত ইতিহাস শুনা যাইত। সুতরাং তাহাতে অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও আনন্দ—সকল রকমেরই লাভ হইত।

রমেশচন্দ্রেরও বাল্যকাল হইতে পিতামাতার সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশ-দেশান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে, অল্পে অল্পে সেই সকল অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ হইতে লাগিল। ইহার ফলে তাঁহার মন অত্যন্ত উদার ও চরিত্র দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল। বালক ধু-ধু বিস্তৃত শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রের শোভা দেখিয়া কখনো একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন, সন্ধ্যায় নদীর উপরে মুক্ত আকাশে নানা বর্ণের মেঘের খেলা দেখিয়া বিভোর হইয়া পড়িতেন, ঢেউয়ের কল-কল এবং পাখীর গান শুনিয়া নাচিয়া করতালি দিতেন, আবার কখনো বা ঝড়ের গর্জ্জন, বজ্রের হুঙ্কার, তরঙ্গের নিনাদ শুনিয়া ভয়ে চক্ষু বুজিয়া কাণে আঙ্গুল দিতেন।

তাহার উপর কত দেশের কত গল্প, কত আশ্চর্য্য উপাখ্যান, কত অদ্ভুত ইতিহাস, কত বীরত্বের কাহিনী, কত দেশ-হিতৈষিতার কথা—কত দানের কথা—কত ধর্ম্মের তথ্য—কত পরোপকারের বৃত্তান্ত প্রভৃতি শুনিতে শুনিতে অবাক হইয়া যাইতেন। তাঁহার নির্ম্মল শৈশব-অন্তঃকরণের ভিতর সে সকলের ছাপ পড়িয়া চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়া যাইত। এইরূপে রমেশচন্দ্রের শৈশব-জীবন মুক্ত প্রকৃতির নানা দৃশ্য, নানা সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া অল্পে অল্পে গঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার ফলে অল্প বয়স হইতেই তাঁহার ধর্ম্মে মতি, সত্যে স্পৃহা, পরিশ্রমে অনুরাগ, অন্যায় কার্য্যে ঘৃণা, এবং সহিষ্ণুতা, বদান্যতা, আত্মনির্ভরতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞার শক্তি প্রভৃতি অতি অল্প আয়াসেই জন্মিতে লাগিল। সুতরাং সাধারণতঃ ছেলের দল যে সব নষ্টামি পাইলে আগেই ছুটিয়া গিয়া নানা অপকর্ম্ম করিয়া বসে, রমেশচন্দ্রের মনের গতি সে সকল দিকে মোটেই গেল না। তিনি নানা স্থান বেড়াইয়া এবং আপনার ঘরে আপনার জনদের সঙ্গেই খেলা-ধূলা করিয়া, তাঁহাদের মধ্যেই সন্তুষ্ট হইয়া বড় হইতে লাগিলেন।

এইরূপে বাল্যকালে তিনি ভাগলপুর, বীরভূম, কুমারখালি, মুর্শিদাবাদ, পাবনা প্রভৃতি নানা স্থানে পিতামাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ ভৃত্য যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বেড়াইয়া খেলিয়া, তাহার মুখে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়া পরম কৌতুকে শৈশব-জীবন কাটাইতে লাগিলেন।

রমেশচন্দ্রের জননীর হিন্দুধর্ম্মে বড়ই আসক্তি ও ভক্তি ছিল। তিনি যখন যে দেশে যাইতেন, সে দেশের যেখানে যে কোন ঠাকুর-দেবতা বা তীর্থস্থান আছে, সে সকলই দর্শন করিতেন। বালক রমেশচন্দ্রও মাতার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দেখিয়া বেড়াইতেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ বা ইতিহাস, কি গল্প প্রচলিত আছে—সে সকল তন্ন তন্ন

করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া শিখিতেন। এইরূপে দেশের ইতিহাস জানিবার জন্য বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে একটা প্রবল বাসনা জন্মিল।

বীরভূমে বক্রেশ্বর তীর্থে মাতার সঙ্গে গিয়া সেখানকার উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিয়া রমেশচন্দ্র এমন মুগ্ধ হইলেন যে তাহার সম্বন্ধে যা কিছু প্রবাদ বা গল্প সংগ্রহ করিবার ছিল যে সমুদয় না শুনিয়া ফিরিলেন না। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার যে সব দেশে ভ্রমণ করিলেন, সে সব স্থানে—যেখানে যা কিছু ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার, কি প্রাকৃতিক যে সব দৃশ্য দেখিবার ছিল, সে সকলই দেখিয়া যতদূর সাধ্য তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যতই নানা স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন ততই বেড়াইবার এবং ইতিহাস জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বীরভূমে কিছুকাল থাকিয়া রমেশচন্দ্রের পিতা কুমারখালিতে এবং তাহার পরে বহরমপুরে বদলি হইয়া গেলেন। রমেশচন্দ্রও পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীদের সঙ্গে কুমারখালি এবং তাহার পরে বহরমপুরে আসিলেন। যখন যেখানে আসিলেন, তখন সেইখানকার স্কুলেই ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে লাগলেন।

কিন্তু বালকের স্বভাব স্বভাবতঃই চঞ্চল,—স্থির হইয়া এক জায়গায় থাকিতে পারে না, সর্ব্বদাই ছুটোছুটি হুটোপাটি করিতেই ভালবাসে। রমেশচন্দ্র বাহিরের ছেলেদের সঙ্গে বড় বেশীক্ষণ মিশিবার সুযোগ পাইতেন না, সুতরাং তাঁহার যত কিছু হুটোপাটি, সে সব বাড়ীতে যুধিষ্ঠির এবং ভাইবোনগুলির সঙ্গেই চলিত। ইহাতে বৃদ্ধ যুধিষ্ঠিরকে সময়ে সময়ে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত। কিন্তু তথাপি পরম

বিশ্বাসী বৃদ্ধ সেই সকল উৎপাতে কিছুমাত্র বিরক্ত হইত না, অকাতরে বালকের সকল উপদ্রব, সকল আবদার সহিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত।

কুমারখালিতে রমেশচন্দ্রদের বাসার ভিতরে বেশী স্থান ছিল না, সেইজন্য যোগেশচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্রকে বাহিরের ঘরে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই থাকিতে এবং তাহার কাছেই শুইতে হইত। তাঁহাদের পিতামাতাও জানিতেন যে বৃদ্ধ যুধিষ্ঠির বালকগণের কিরূপ উপযুক্ত অভিভাবক—তাঁহাদের দিকে যদি বা কিছু ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু কি স্নেহে, কি যত্নে, কি শাসনে, কি পরিচর্যায়, কি রক্ষণাবেক্ষণে বালকগণের পক্ষে যুধিষ্ঠিরের দিকে এক চুলও ত্রুটি নাই। সুতরাং তাঁহারা সেই বৃদ্ধ ভৃত্যের উপরে বালক দুটির ভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। যুধিষ্ঠিরও সে ভার আনন্দিত মনে উৎসাহের সহিত বহন করিতেছিল।

সারাদিন বালকদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, তাহাদের সঙ্গে ছুটো-পাটি করিয়া, বেড়াইয়া সন্ধ্যাবেলা যদিবা বৃদ্ধ ক্লান্ত হইয়া পড়িত, কিন্তু তবুও তাহার নিস্তার থাকিত না। সন্ধ্যার পরে বালকেরা পড়াশুনা করিতে বসিলে যুধিষ্ঠিরকে বসিয়া থাকিয়া চৌকি দিতে হইত—কেহ পড়াশুনা করিতে ফাঁকি দেয় কি না। বালকেরা পিতামাতাকে যেরূপ ভয় করিত, যুধিষ্ঠির চাকর এবং তাহাদের খেলিবার সাথী হইলেও তাহাকে সেইরূপই ভয় করিত। সুতরাং সে যতক্ষণ বসিয়া থাকিত, কিছুতেই পড়াশুনায় অবহেলা করিতে পারিত না।

পড়াশুনা হইয়া গেলে আহারাদির পরে বালকেরা যখন শুইতে যাইত, তখনও যুধিষ্ঠিরের বিশ্রাম ছিল না। যতক্ষণ না যোগেশ ও রমেশ-চন্দ্র শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন, ততক্ষণ তাহাকে কাছে বসিয়া রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে হইত। যোগেশচন্দ্রের কাছে যদিবা বৃদ্ধ অনেক সময় ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু রমেশচন্দ্রের কাছে কিছুতেই

তাহার ফাঁকি চলিত না। বালকের চক্ষুদুটি ঘুমে ঢুলু ঢুলু করিতেছে দেখিয়া যদি যুধিষ্ঠির রামায়ণ মুড়িত, অমনি বালকের ঘুমের ঘোর যেন কোন মন্ত্রবলে ছুটিয়া যাইত, উঠিয়া বসিয়া আরও মন দিয়া শুনিতে আরম্ভ করিতেন।

সুতরাং যুধিষ্ঠিরও আর ফাঁকি দিয়া রামায়ণ বন্ধ করিয়া শুইতে পারিত না। এক একটা উপাখ্যান সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া গেলে বালকের চক্ষু দুটি যখন ঘুমে একেবারে বুজিয়া যাইত, তখন সে অব্যাহতি পাইয়া হাঁফ ছাড়িত। কোনদিন কোন উপাখ্যানই সে একেবারে শেষ না করিয়া নিষ্কৃতি পাইত না। বালকের চক্ষুদুটি ঘুমে যতই ঢুলু ঢুলু করুক না কেন, তাঁহার মনটি সম্পূর্ণ সজাগ থাকিয়া রামায়ণের প্রত্যেক কথাটি যেন গিলিতেন সুতরাং, মাঝখান হইতে যে খানিকটা বাদ দিয়া পড়িবে—বেচারার তারও জো ছিল না। সেরূপ করিতে গেলে রমেশচন্দ্রের হাতে তাহাকে আরও বেশী নাকাল হইতে হইত।

এইরূপে বছরখানেক কুমারখালিতে থাকিবার পর ঈশানচন্দ্র বদলি হইয়া সপরিবারে বহরমপুরে গমন করিলেন। যোগেশ ও রমেশ চন্দ্র কুমারখালির স্কুল ছাড়িয়া আসিয়া বহরমপুরের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বহরমপুরে আসিয়া যদিও বালক দুইজনকে কুমারখালির মত বাহিরে যুধিষ্ঠিরের কাছে শুইতে হইত না, কিন্তু তাহাতেও তাহার নিষ্কৃতি ঘটিল না।

একমনে কাজ করিলে সে কাজটা যত সহজে যত শীঘ্র শেষ হইয়া যায়, অন্যমনস্ক ভাবে কিম্বা অনিচ্ছার সহিত করিলে তাহাতে তেমনি বিলম্ব হয় অথচ কাজটাও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। অনেক বালকই অনিচ্ছার সহিত অন্যমনস্ক হইয়া পড়া করে বলিয়া সারাদিন ধরিয়া বইয়ে মুখে বসিয়া থাকিয়াও পড়া শেষ করিয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের পড়িবার সময় আর যেন ফুরাইতে চাহে না।

কিন্তু রমেশচন্দ্রের প্রকৃতি সেরূপ নহে। তিনি যখন যাহা করিতে বসেন, তাহাতে একেবারে মগ্ন হইয়া যান, তখন আর অন্য কোন বিষয়ের কথাই তাঁহার মনে থাকে না। সুতরাং সেইরূপ ভাবে এক মনে মগ্ন হইয়া পড়া করিতে বসিলে অতি শীঘ্রই প্রতিদিনের সকল পড়াই শেষ হইয়া যায় এবং তাহার পরে পুরাতন পড়া শেষ করিয়াও খেলিবার জন্য যথেষ্ট সময় থাকে। ইহাই হইল যুধিষ্ঠিরের পক্ষে বেশী বিপদের কথা।

বালক পড়িতে বসিয়া অতি অল্পক্ষণ বই নাড়াচাড়া করিয়া সমস্ত পড়া শিখিয়া ফেলেন—জিজ্ঞাসা করিলে টক্ টক্ করিয়া বলিয়া যান, স্কুলেও সকলের উপরে থাকেন, শিক্ষকমহাশয়েরাও অজস্র প্রশংসা করেন, সুতরাং পডাশুনায় যে ফাঁকি দিতেছেন না একথা নিশ্চয়। তবে এত সময় পান কি করিয়া? আর সময় পাইলেও যুধিষ্ঠিরের বিপদ! যুধিষ্ঠির ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না যে অন্য ছেলেরা যে সব পড়া ঢের বেশীক্ষণ ধরিয়া পড়িয়াও তৈয়ারী করিয়া উঠিতে পারে না—রমেশচন্দ্র সে সকল অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া সুচারুরূপে শিখিয়া ফেলেন? অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই পড়া করিতে পারেন বলিয়াইত খেলিবার জন্য এত বেশী সময় পান এবং তাহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়!

কিন্তু তবুও বৃদ্ধ তাঁহাদের লইয়া খেলিতে বেড়াইতে, গল্প শুনাইতে, রামায়ণ পড়িতে একটুও ব্যাজার হয় না। এইরূপে প্রতিনিয়ত এই বিশ্বাসী হিতৈষী বৃদ্ধ ভৃত্যবন্ধুর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, যত্ন, আদর, আশীর্ব্বাদ, শুভাকাঙ্ক্ষা এবং শাসন লইয়া বালকের দিন কাটিতে লাগিল।

সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বপ্রথম ছোটলাট স্যর্ ফ্রেডরিক হ্যালিডে বাহাদুর বহরমপুরে এক দরবার করিলেন এবং সেই দরবারে রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্র নিমন্ত্রিত হইলেন। বহরমপুরে ভারি ধূম পড়িয়া গেল—অষ্টপ্রহরই সকলের মুখে কেবল সেই দরবারের কথা—

সহর সরগরম হইয়া উঠিল। স্কুলের ছুটী হইল, ছেলেরাও দরবারের ধুম দেখিয়া আনন্দে মত্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিল।

বালক রমেশচন্দ্রও ছুটী পাইলেন, দরবারের ধুমধাম দেখিলেন, কিন্তু তখন তিনি কোনরকম রাজনৈতিক ব্যাপারের কিছুই বুঝিতেন না বলিয়া সে দরবার তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি দরবারের সমারোহ হইতে দূরে গিয়া শ্যামল শস্যক্ষেত্রে—গঙ্গাতীরে—বাগানে বাগানে বেড়াইয়া পল্লীসকলের শান্তিময় সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া বেশী আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

বহরমপুর হইতে ঈশানচন্দ্র আবার কিছুদিন পরে পাবনায় বদলী হইলেন। সুতরাং রমেশচন্দ্রকেও তাঁহাদের সহিত বহরমপুর ছাড়িয়া পাবনায় গিয়া সেখানকার স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হইল।

পাবনায় গিয়া পদ্মার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বালকেরা একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। বিশেষ রমেশচন্দ্র একটু অবসর পাইলেই ছুটিয়া গিয়া পদ্মাতীরে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিতেন। ভ্রমণের সখটা তাঁহার জীবনের সঙ্গে বড় বেশী রকম জড়াইয়া পড়িল, বেড়াইয়া বেড়াইয়া তবুও আর আশ মিটিত না।

অতি অল্প সময়েই পড়াশুনা হইয়া যায়, তারপর খেলিবার ও বেড়াইবার সময় প্রচুর থাকে। রমেশচন্দ্র সেই সকল সময়ের বেশীর ভাগই পদ্মাতীরে গিয়া বেড়াইয়া বেড়ান। তাহা ছাড়া যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন—ছুটোপাটি খেলায় বাড়ীটা যেন সজীব করিয়া তুলেন। সকলেই বলে বালক অত্যন্ত চঞ্চল—অত্যন্ত দুষ্ট। বকিয়া ঝকিয়া বাড়ীর লোক হার মানিয়া যায়, তবু কিছুতেই বালকের সেই উদ্দাম চঞ্চল প্রকৃতি শান্ত হয় না।

কিন্তু এত অশান্ত, এরূপ চঞ্চল হইলেও, পড়াশুনা করিবার

সময়টুকু রমেশচন্দ্র এমন একমনে বইয়ের ভিতরে মগ্ন হইয়া থাকেন যে, তাহার ফল সর্ব্বদাই বড় মধুময় হয়। পাবনা স্কুলে পরীক্ষায় তিনি সকলের উপরে উঠিয়া যেদিন প্রাইজ লইয়া গৃহে আসিলেন. সেদিন সকলেই অবাক হইয়া ভাবিল যে, এরূপ অশান্ত চঞ্চল বালক স্কুলে পড়াশুনায় এরূপ উত্তম ফল লাভ করে কেমন করিয়া ?

কিন্তু সে সুখ্যাতির দিকে বালকের দৃষ্টি ছিল না—যখন যাহা করিতেন, তাহাই কর্ত্তব্যবোধে নিতান্ত নিবিষ্টচিত্তে মগ্ন হইয়াই করিতেন। সুতরাং কি খেলায়, কি পড়ায়, কি চঞ্চলতায়, কি দুরন্তপনায় রমেশচন্দ্র সকল বিষয়েই সকল বালকের উপরে উঠিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বালকদের খেলার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বা ঠিক-ঠিকানা ছিল না, যেদিন যেরূপ মনে লইত, সেদিন সেইরূপ খেলা খেলিত।

পাবনায় রমেশচন্দ্রের বাহির বাটীতে সিন্দুকের মত একটা বড় বাক্স ছিল—সেটার উপরে একটা লোহার শিকলি আঁটা থাকিত, কিন্তু তালা চাবি দিয়া বন্ধ করা হইত না। বালকেরা একদিন সেই বাক্সটাকে লইয়া একটা নূতন খেলার সৃষ্টি করিল।

এক এক জন বালক তাহার ডালা তুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে অমনি অন্য বালকেরা আসিয়া তাহার ডালা ফেলিয়া শিকলি টানিয়া দেয়। তাহার পালা হইয়া গেলে আবার শিকলি খুলিয়া ডালা তুলিয়া তাহাকে বাহির করিয়া অন্য একজন তাহার ভিতরে গিয়া বসে। এইরূপ পালা করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সেদিন খেলা চলিতেছিল।

জনকতক ছেলের পালা শেষ হইয়া গেলে, রমেশচন্দ্রের দাদা

যোগেশচন্দ্রের পালা আসিল, তিনি যথানিয়মে বাক্সের ভিতরে ঢুকিলেন এবং ছেলেরাও ডালাটা চাপা দিয়া শিকল টানিয়া দিল।

কিন্তু বাক্সের ভিতরে ঢুকিয়াই যোগেশচন্দ্রের গলদ্‌ঘর্ম্ম হইল, তাঁহার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল, বুকের ভিতরে ধড়্‌ফড়্‌ করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষে অন্ধকার ঠেকিল, সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল—প্রাণ যায়!

যোগেশচন্দ্র মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাক্সের ডালাটায় ক্রমাগত ধাক্কা দিয়া ঘা মারিতে লাগিলেন। ইহার ফলে শিকলটা আরও বেশী জোরে আটকাইয়া গেল এবং ডালাটা আরও আঁটিয়া গেল।

যোগেশচন্দ্রের কাতর আর্ত্তনাদ শুনিয়া বালকেরা বড় ভয় পাইল, সকলেই তাড়াতাড়ি গিয়া শিকলটা ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে খুলিবার চেষ্টা পাইল। ওদিকে ভিতর হইতে যোগেশচন্দ্র প্রাণের দায়ে ডালাটা ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিতেছেন—সুতরাং সেটা শিকলটাকে আরও বেশী আঁটিয়া দিতেছে। বালকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কেহই সেই শিকলটা আল্‌গা করিয়া খুলিতে পারিল না।

এদিকে যোগেশচন্দ্রও ক্রমে মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিলেন—ক্রমেই তাঁহার সমস্ত শক্তি যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল—আর একটুখানি সে অবস্থায় থাকিলে যে দমবন্ধ হইয়া প্রাণ যাইত তাহাতে সন্দেহমাত্র ছিল না; তিনি শেষ চেষ্টায় প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ভিতর হইতে কাঁদিয়া উঠিলেন।

তখন রমেশচন্দ্রের মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলিল। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেদের ঠেলিয়া এক লাফে বাক্সটার ডালার উপরে উঠিয়া সজোরে চাপিয়া বসিলেন। ইহার ফলে বাক্সের ডালাটা যেমন বেশী রকম চাপিয়া বসিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে শিকলটাও আল্‌গা হইয়া গেল। তখন

ছেলেরা অতি সহজেই সেটাকে খুলিয়া ডালা তুলিয়া যোগেশচন্দ্রকে টানিয়া বাহির করিল। বালক রমেশচন্দ্রের এই উপস্থিতবুদ্ধির বলেই সেদিন যোগেশচন্দ্রের প্রাণ রক্ষা হইল।

সেই সময়ে পশ্চিমে সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল, প্রতিদিন পাবনাতে নানাস্থান হইতে নানারূপ যুদ্ধের সংবাদ আসিতে লাগিল। বালক রমেশচন্দ্র সেই সকল ইতিহাস একমনে শুনিতে লাগিলেন।

সেই সিপাহী-বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্ট পাবনাতে একদল ফৌজ রাখিয়া দিয়াছিলেন—তাহারা পথে ঘাটে বড়ই উপদ্রব করিয়া বেড়াইত। রমেশচন্দ্রের প্রাণ তাহাতে অত্যন্ত কাতর এবং সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, এমন ইচ্ছা হইত যে ছুটিয়া গিয়া তাহা-দিগকে দমন করেন। কিন্তু তাঁহার সে শক্তি কোথায়? সুতরাং নিষ্ফল আক্রোশে মনে মনে গর্জ্জিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইত। সেই সময়ে তিনি মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন যে প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াও এমন বড় হইতে হইবে, যাহাতে দুর্ব্বলের উপরে সবলের এইরূপ অন্যায় অত্যাচার দমন করিতে পারি। বাল্যকালের সেই দৃঢ়পতিজ্ঞার কথা তিনি জীবনে ভুলেন নাই এবং সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ফলেই ভবিষ্যতে তিনি যে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কে না অবগত আছেন?

সিপাহী-বিদ্রোহ থামিয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট পাবনা হইতে সেই সব ফৌজ সরাইয়া লইয়া গেলেন—দেশে যেন শান্তি আসিল। সেই সৈন্যেরা যখন পাবনা ছাড়িয়া যায়, তাহার ঠিক পূর্ব্বেই ইংরাজী 'ম্যাক্‌বেথ' নাটক অভিনয় করিল। রমেশচন্দ্র পিতার নিকট হইতে 'ম্যাক্‌বেথের' গল্পটি শুনিয়া সেই থিয়েটার দেখিতে গেলেন। থিয়েটার দেখিয়া রমেশচন্দ্র বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রথম অভিনয় দর্শন।

বছর দুই পাবনায় থাকার পরে তাঁহারা ইংরাজী ১৮৫৯ সালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ভ্রাতাদ্বয় আবার কলিকাতার স্কুলেই ভর্ত্তি হইলেন। সেই বৎসরেই ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে রমেশচন্দ্রের মাতার মৃত্যু হইল। এই ঘটনায় বালকেরা যে কিরূপ শোক পাইলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না।

বালকেরা মাতৃহীন হইলেন বটে, কিন্তু তবুও ঈশানচন্দ্র তাঁহাদের কাছে কলিকাতায় বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। রাজকার্য্যের জন্য আবার তাঁহাকে মফঃস্বলে বদলি হইয়া যাইতে হইল।

এক্ষণে বালকেরা একটু বড় হইয়াছিল, এখন হইতে পড়া-শুনার দিকে বিশেষ মন না রাখিলে চলিবে না ভাবিয়া, এবার আর ঈশানচন্দ্র তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলেন না। চিরবিশ্বাসী বৃদ্ধ যুধিষ্ঠির এবং আর একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ দরোয়ানের উপর বালকদের ভার দিয়া ঈশানচন্দ্র কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন।

মাসকতক পরে তিনি ছুটী পাইয়া আবার কলিকাতায় যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন যে পুত্রেরা লেখাপড়ায় অনেক উন্নতি করিয়াছে—ইংরাজী সাহিত্যের উপরে তাহাদের বেশ অনুরাগ জন্মিয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তিনি বালকগণকে লইয়া বসিয়া ইংরাজী আরব্য-উপন্যাস এবং অন্যান্য নানারকমের পুস্তক পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া নানা রকম দেশ-বিদেশের গল্প করিতে লাগিলেন। ইহাতে বালকেরা যেরূপ আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভও তেমনি হইতে লাগিল। বিশেষ রমেশচন্দ্রের ইংরাজী সাহিত্যের উপরে এমন আকর্ষণ ও অনুরাগ বাড়িয়া গেল যে, তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে তিনি যেন রাতারাতির মধ্যেই ইংরাজীতে পরম পণ্ডিত হইয়া সমস্ত বইগুলি পড়িয়া ফেলেন। সেই সময় হইতে রমেশচন্দ্রও প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

পুত্রের এতাদৃশ আকিঞ্চন দেখিয়া ঈশানচন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রমেশচন্দ্রকে কহিলেন—"এখানে ভালরকম পাশ করিতে পারিলে তোমাকে আমি বিলাতে পাঠাইয়া দিব।"

রমেশচন্দ্রও যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত কহিলেন—"আপনি দেখিয়া লইবেন, আমি খুব ভাল রকমই পাশ করিব।" কিন্তু হায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুত্র রমেশচন্দ্র যে কেমন করিয়া তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন, তাহা দেখা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না।

ছুটী ফুরাইলে ঈশানচন্দ্র আবার কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন যে এখন হইতে তাঁহাকে সর্ব্বদা নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধারণ করা উচিত, সেই জন্য এবার ফিরিয়া আসিয়া তিনি পেন্সন লইয়া বাড়ীতে থাকিবেন, আর পুত্রদের একেলা রাখিয়া বিদেশে যাইবেন না। পিতা চলিয়া গেলে পুত্রেরা যুধিষ্ঠির ও সেই হিন্দুস্থানী দরোয়ানের কাছে কালকাতায় থাকিয়াই পড়াশুনা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়, সেই পুত্রবৎসল পিতা ঈশানচন্দ্রের সহিত বালকদের আর সাক্ষাৎ ঘটিল না। ইংরাজী ১৮৬১ সালের ৮ই মে তারিখে ঈশানচন্দ্র কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী একটা খালের ভিতরে নৌকা-ডুবি হইয়া প্রাণ হারাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যখন রমেশচন্দ্র পিতৃহীন হইলেন, তখন তাঁহার বয়স বার-তের—নিতান্ত বালক মাত্র। তাঁহার বড়দাদা যোগেশচন্দ্র তাঁহার অপেক্ষা বছর

খানেকের বড়, সুতরাং তিনিও বালক। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের বিপদে পড়িবার সম্ভাবনাই বেশী ছিল, কিন্তু সেই সময়ে তাঁহাদিগের খুড়া শশীচন্দ্র আসিয়া স্নেহভরে তাঁহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইলেন। এই শশীচন্দ্রের চরিত্রের উজ্জ্বল উচ্চ আদর্শেই রমেশচন্দ্রের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল।

শশীচন্দ্র প্রাচীন হিন্দুকলেজের একজন নামজাদা ছাত্র। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সেই প্রথম সময়ে এই হিন্দুকলেজ হইতে যে সকল ছাত্র উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা করিয়া দেশে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল—শশীচন্দ্রও তাঁহাদের মধ্যে একজন। মাইকেল মধুসূদন, রাজা রামমোহন প্রভৃতির মত ইনিও ইংরাজীতে পরম পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

শুধু তাহাই নহে। ইংরাজী ভাষা শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে তিনি সেই সাহিত্যচর্চ্চাই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন এবং সেই ছাত্র-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত কেবল সাহিত্য-চর্চ্চাই করিয়া গিয়াছেন।

শশীচন্দ্র ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, আত্মনির্ভরশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অত্যন্ত স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। হিন্দুকলেজে পড়িবার সময় হইতেই ইংরাজীতে প্রবন্ধ এবং কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে যত বড় হইতে লাগিলেন—যত বেশী লেখা পড়ায় পণ্ডিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন, ততই সেই লিখিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ততই সেই বিষয়ে একান্তচিত্ত হইয়া তিনি সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে সেই যে আরম্ভ করিলেন—মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা সমভাবেই করিয়া গেলেন।

সেই সময়ের সংবাদপত্রে এবং বিলাতের বড় বড় কাগজে শশীচন্দ্রের প্রবন্ধ এবং কবিতার বিস্তর সুখ্যাতি বাহির হইতে লাগিল; তাঁহার লিখিত 'তিন চার খানি পুস্তক বিলাতী সাহিত্যের মধ্যে আদরে

উচ্চশ্রেণীতে স্থান পাইল। এমন কি, তাঁহার লিখিত "শঙ্কর" নামক উপন্যাস পড়িয়া বড় বড় রাজপুরুষগণ মোহিত হইলেন—সেই পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্গে শশীবাবুর কয়েকখানি চিঠিপত্র লেখা পর্যান্ত চলিল। এইরূপে বড় বড় ইংরাজ পণ্ডিত এবং রাজপুরুষগণের সঙ্গে শশীচন্দ্রের জানা-শুনা, আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল—সকলেই শশীচন্দ্রের গুণে মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার নাম দেশমান্য হইয়া উঠিল।

ক্রমে শশীচন্দ্র বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের প্রধান সহকারীর উচ্চপদ লাভ করিয়া 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করিলেন। এইরূপে তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সুখ্যাতির সহিত করিয়া সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

সে সময়ের সকল লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরগণই শশীচন্দ্রের গুণে, কার্য্যতৎপরতায় এবং বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সকলেই একবাক্যে তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে দেশে-বিদেশে অশেষ সম্মানভাজন হইয়া, দেশ-জোড়া নাম রাখিয়া অবশেষে শশীচন্দ্র ইংরাজী ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

যতদিন রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্র জীবিত ছিলেন, ততদিন শশীচন্দ্রের তাঁহাদিগের ভার লইবার প্রয়োজন হয় নাই. কিন্তু ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পর বালকবালিকাগুলি যখন অনাথ, অভিভাবকহীন হইয়া পড়িল, তখন শশীচন্দ্র আপন ইচ্ছায় আসিয়া তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইয়া লালন-পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং রমেশচন্দ্র এবং তাঁহার ভাই-বোনগুলির আর অভিভাবকশূন্য হইয়া কষ্টে পড়িতে হইল না।

সেই সময় হইতেই রমেশচন্দ্রের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল বলিতে হইবে। এতদিন যে বালক বাপের আদরে বাড়িতেছিলেন—বাপের অভাবে তাঁহার মনে যে ঘা লাগিল, তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের সূত্রপাত হইল।

রমেশচন্দ্রের চঞ্চলতা দূর হইল, সংসারের সকল বিষয়েই যেন লক্ষ্য পড়িল, নিজের ভবিষ্যতের ভাবনা আসিল—সহসা তাঁহার ভিতরে যেন আগাগোড়া একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল, তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের উন্নতি করিতে মন দিলেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রের মনের ইচ্ছা এবং গুণগ্রাম টের পাইতে শশীচন্দ্রের বিলম্ব হইল না, তিনি বুঝিলেন যে এই বালকের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে, ইহাকে সর্ব্বদাই উচ্চ বিষয়ের দিকে চালিত করিবার চেষ্টা করিলে, ভবিষ্যতে বড়ই সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি রমেশচন্দ্রকে বিশেষ যত্নের সাহিত মানুষ করিয়া তুলিতে মনোযোগী হইলেন।

তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল না। রমেশচন্দ্র দেখিলেন তাঁহার খুড়া 'বইয়ের পোকা'—সর্ব্বদাই পড়াশুনায় মগ্ন হইয়া থাকেন, রাজকার্য্যের অবসরে যে সময়টুকু পান—সে সময়টুকু সাধারণ লোকেদের মত তাস-পাশা খেলিয়া, গল্পগুজব করিয়া না কাটাইয়া, কেবল বই লইয়াই থাকেন। ইহাতে যে তিনি কি আনন্দ পান, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার বড় কৌতূহল হইল। সুতরাং তাঁহার দেখাদেখি বালকও সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। দিনকতক সেইরূপ করিতেই বুঝিলেন যে ইহার ভিতরে যে আনন্দ, যত মধু সঞ্চিত আছে—তাহা আর সংসারের কোন কিছুর মধ্যেই নাই, তখন রমেশচন্দ্রও সাহিত্যের প্রতি বড়ই অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

শুধু তাহাই নহে, খুড়ার এক একটি লেখা বাহির হয়, অমনি চারিদিকে তাহা লইয়া হৈ হৈ পড়িয়া যায়। কাগজে কতরকম করিয়া সমালোচনা করে, কত সুখ্যাতি করে, কত বড় বড় লোক তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কত লোক কত চিঠি-পত্র লেখেন! রমেশচন্দ্রেরও ইচ্ছা হইল—তিনিও সাহিত্য-সেবা করিয়া খুড়ার মত সর্ব্বসাধারণের সম্মানভাজন হইয়া দেশবিখ্যাত হইবেন।

কিন্তু শুধু মনে মনে ইচ্ছা লইয়া বসিয়া থাকিলে তো হয় না, তিনি কতটুকুই বা লেখাপড়া শিখিয়াছেন, সাহিত্য-ভাণ্ডার যে অনন্ত—অফুরন্ত—সীমা নাই। তখন তিনি বুঝিলেন যে এই ভাণ্ডার হইতে রত্ন সঞ্চয় করিতে হইলে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে—সারাজীবন ধরিয়া সাধনা করিতে হইবে—তবে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

তখন হইতেই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই চেষ্টায় লাগিলেন, একটী মুহূর্ত্তও বাজে নষ্ট না করিয়া কেবল বিদ্যাচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন। দিন কতক সেইরকম অভ্যাস করিতে করিতেই তাহা এমন সহজ বোধ হইল যে তিনি সেই বাল্যকাল হইতেই পড়াশুনায় খুব শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করিতে লাগিলেন। আর যতই উন্নতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনে আরও বেশী জানিবার—আরও বেশী পড়িবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে খুড়ার মত তিনিও বইয়ের ভিতরেই দিবারাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। যিনি বাল্যকাল হইতেই এরূপ ঐকান্তিক মন-প্রাণে সরস্বতীর আরাধনা করিতে পারেন—মা কি তাঁর উপর সদয় না হইয়া থাকিতে পারেন?

লেখাপড়ায় রমেশচন্দ্রের এমন আন্তরিক অনুরাগ দেখিয়া শশীচন্দ্রের মনে বড়ই আশা, বড়ই উৎসাহ জাগিল। তিনি রমেশচন্দ্রকে সর্ব্বদাই সদুপদেশ দিয়া, সৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, শক্ত বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিয়া পদে পদে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সোনায় সোহাগা মিশিল—রমেশচন্দ্র দিন দিন উন্নতির পথে চলিলেন।

সর্ব্বদা খুড়ার সহবাসে থাকিয়া, খুড়ার অনুকরণ করিয়া, রমেশ-চন্দ্রের স্বভাবচরিত্রও দিন দিন শশীচন্দ্রের মত হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই বয়স হইতেই বালক ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, আত্ম-নির্ভরশীল, উদার এবং স্বাধীনচিত্ত হইয়া উঠিল।

বর্ষাকালে জলের ঢল নামিলে তাহা যেমন প্রবল বেগে সমস্ত

বাধাবিঘ্ন কাটাইয়া আপনার ইচ্ছানুযায়ী বহিয়া চলিয়া যায়, তেমনি মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন মনের সমস্ত ইচ্ছাবৃত্তি-গুলিকে যে দিকে পরিচালিত করা যায়, সেই দিকেই প্রবলবেগে বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া ছুটিয়া অগ্রসর হইয়া যায়। বাল্যকাল হইতেই রমেশচন্দ্র অন্তরের সমস্ত ইচ্ছাপ্রবৃত্তিগুলিকে যে পথে চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—এখন যৌবনের প্রারম্ভে সেগুলি শতগুণ প্রবল হইয়া সেই দিকেই উন্মাদবৎ ছুটিয়া চলিল—কোন রকম বাধা-বিঘ্ন তাহাদিগকে বাধা দিয়া আটকাইয়া রাখিতে বা অন্যপথে চালাইতে পারিল না।

তখন রমেশচন্দ্র কলিকাতার হেয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। কিন্তু সেই শ্রেণীর সমস্ত বালকের চেয়ে তিনি এত বেশী পড়িয়া ফেলিয়াছেন যে, তাহাদিগকে পড়াইতে বলিলেও তিনি স্বচ্ছন্দে সে কার্য্য করিতে পারিতেন। সকল শিক্ষকেরাই তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চা করিবার ইচ্ছা ও শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া পড়িলেন।

শশীচন্দ্র খৃষ্টিয়ান হইলেও তখনকার হিন্দু-সমাজের প্রথা দেশে এমন প্রবল ছিল যে, তাঁহারা সাংসারিক সকল বিষয়ে তাহা সর্ব্বপ্রকারে ছাড়াইয়া চলিতে পারিতেন না। রমেশচন্দ্রের অভিভাবক-গণ দেশের প্রথা অনুযায়ী সেই সময়ে তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

তখন রমেশচন্দ্রের পনের বৎসর বয়স—সেই বছরেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবেন। কিন্তু অভিভাবকগণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারি-লেন না। কলিকাতা—সিমলার শ্রীযুক্ত নবগোপাল বসু মহাশয়ের মধ্যমকন্যা শ্রীমতী মোহিনীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন।

আজকাল লোকে বলে—অল্পবয়সে বিবাহ দিলে, বর-কনের জীবন পরিণামে দুঃখময় হইয়া পড়ে, কিন্তু রমেশচন্দ্রের সেই অল্প বয়সের

বিবাহ কিছুমাত্র দুঃখময় না হইয়া বরং পরম সুখ ও শান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল।

বিবাহের পর হইতে রমেশচন্দ্রের কর্ত্তব্যবুদ্ধি যেন আরও শতগুণে বাড়িয়া গেল, সমস্ত চিত্তবৃত্তিগুলি প্রবল হইয়া আরও শতগুণ তেজের সহিত তাঁহাকে দিন দিন উন্নতির পথেই টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেই বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে ইংরাজী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় এমন সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন যে, সে স্কুল হইতে যতগুলি ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তিনি তাহাদের সকলের উপরে একেবারে প্রথম হইয়া মাসিক ১৪৲ চৌদ্দ টাকা বৃত্তি পাইলেন। তাহার পর তিনি এফ্ এ পড়িবার জন্য কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন।

বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যের উপর রমেশচন্দ্রের যেমন প্রবল আকর্ষণ ছিল—অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তেমন ছিল না। সাহিত্য-সম্বন্ধীয় যা কিছু তা তিনি যেমন একাগ্রচিত্তে পড়িয়া একেবারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিতেন, অন্য বিষয়ে তেমন মন দিতেন না, সুতরাং ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে যেমন উন্নতি করিয়াছিলেন, অঙ্কে তেমন করিতে পারেন নাই। যদিও প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় অল্প স্বল্প গণিত শিক্ষার কালে তাহাতে কিছু ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে তাহা হইল না। কলেজে ভর্ত্তি হইয়া যখন তাঁহাকে বেশী গণিত-চর্চ্চা করিবার প্রয়োজন হইল, তখন তিনি সে দিকে মন দিতে পারিলেন না। ইহা শিক্ষকগণের নজরে পড়িল।

তখন স্বনামধন্য মহাপুরুষ বঙ্গদেশের গৌরব স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে তিনি গণিত শিখাইতেন।

সেই শ্রেণীর বালকগণকে বাড়ী হইতে কসিয়া আনিবার জন্য তিনি প্রত্যহই কয়েকটি করিয়া অঙ্ক দিতেন। রমেশচন্দ্র তাহা মোটেই কসিয়া লইয়া যাইতেন না।

দুই তিন দিন ধরিয়া রমেশচন্দ্র যখন সে সকল অঙ্ক বাড়ী হইতে কসিয়া লইয়া গেলেন না, তখন গুরুদাস বাবু একদিন তাহা বেশ লক্ষ্য করিলেন এবং রমেশচন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি একদিনও অঙ্ক কসিয়া আন না কেন?"

রমেশচন্দ্র সত্যবাদী—স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "অঙ্ক কসিতে আমার মোটেই ভাল লাগে না, উহার ভিতরে ঢুকিতে পারি না—ইচ্ছাও হয় না।"

তখন গুরুদাস বাবু বুঝাইয়া বলিলেন—"দেখ রমেশ, এই সকল অঙ্ক কসিতে যে খুব বেশী মাথার দরকার হয়, বা খুব বেশী বুদ্ধি খাটাইতে হয়—তা নয়। নিউটনের মত প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ না হইলে যে অঙ্ক কসিতে পারে না, তা তুমি মনে করিও না। ছেলেবেলা হইতে যেদিকে মন দিয়াছ, তাহাই উত্তমরূপ শিখিয়াছ এবং শিখিতেছ, অঙ্কের প্রতি একটুও মন দেও নাই, তাই তাহা শিখিতে পার না—ইচ্ছাও হয় না। তুমি একবার একটুখানি ভাল করিয়া মন দিয়া চেষ্টা কর দেখি—তখন দেখিবে—এ সকল অঙ্ক কিছুই কঠিন নহে; সাহিত্যের মত গণিতশাস্ত্রও তোমার কাছে অতি সহজ ও সরল বোধ হইবে, তখন আর গণিতের প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা থাকিবে না। অশ্রদ্ধা করিয়া করিতে গেলে কোন বিষয়ই শেখা যায় না—কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছার সহিত চেষ্টা করিলে

যতই কঠিন বিষয় হউক না কেন, অতি সহজেই সে বিষয় আয়ত্ত হইয়া যায়।"

রমেশচন্দ্র মুখে কোন রকম জবাব করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা হইল—"ভাল, দেখা যাউক না কেন, অঙ্কশাস্ত্রটা কেমন?"

যেমন ইচ্ছা—তেমনই প্রতিজ্ঞা—আর তেমনই কাজ! সেইদিন হইতেই অঙ্ক শিখিবার জন্য রমেশচন্দ্রের ঐকান্তিক ইচ্ছা হইল—তিনি সে বিষয়ে মন লাগাইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন দেখিতে দেখিতে সাহিত্যের মত গণিতশাস্ত্রেও তিনি সুন্দররূপ উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া গুরুদাস বাবু অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ক্রমে রমেশচন্দ্রের অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি যে অশ্রদ্ধা ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল—সাহিত্যের মত অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিল, সুতরাং তাঁহার ফল ভাল না হইবে কেন? দুই বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়া তিনি এফ্‌ এ পরীক্ষা দিলেন। সে পরীক্ষার ফলও বড়ই সন্তোষ-জনক হইল—এবারে যত ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল তিনি, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পাশ করিলেন। প্রথম হইতে পারিলেন না বলিয়া বিশেষ আক্ষেপের কারণ রহিল না, কারণ যে ব্যক্তি প্রথম হইয়াছিলেন, তিনি রমেশচন্দ্রের অপেক্ষা কেবলমাত্র এক নম্বর বেশী পাইয়াছিলেন, সুতরাং দু'জনার মধ্যে প্রভেদ কিছুই ছিল না। এবারে এফ্‌ এ পরীক্ষায় পাশ হইয়া তিনি মাসিক ৩২৲ বত্রিশ টাকা বৃত্তি পাইলেন।

এই সময় হইতে সকল বিষয়েই পড়াশুনা যতই অধিক বাড়িতে চলিল, ততই তাঁহার সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশ ও সুনাম অর্জ্জন করিবার ইচ্ছাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলাত যাইবার

আগ্রহ উপস্থিত হইল। এদেশের তখনকার দিনের শিক্ষালাভ এখনকার মত এমন বিস্তৃত হয় নাই, সেই সময়ে এদেশে প্রথম বি. এ. পরীক্ষার সৃষ্টি। সেই বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলেই এখানকার পড়াশুনা শেষ হইয়া যাইত। তারপর আপন আপন ইচ্ছামত কেহ কেহ আইন পাশ করিতেন, কেহ কেহ অন্য দিকে যাইতেন।

কিন্তু রমেশচন্দ্রের মন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। দিন দিন যতই অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, ততই লেখা-পড়ার দিকে আরও বেশী টান—বেশী আগ্রহ জন্মিল। কেমন করিয়া আরও বেশী পড়িবেন, আরও বেশী লিখিবেন, আরও বেশী জ্ঞানলাভ হইবে—পৃথিবীর নানা দেশের নানা বিবরণ জানিতে লিখিতে ও বুঝিতে পারিবেন—তাহার জন্য মন উতলা হইল। কিন্তু এখানে থাকিলে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? বি. এ. পাশ করিয়াই তো পড়াশুনা শেষ হইয়া যাইবে। কাজেই, বিলাতে গিয়া আরও অধিক বিদ্যালাভ করিবার বাসনা মনের মধ্যে প্রবল হইয়া জাগিয়া উঠিল। তিনি দিবারাত্রি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

কথায় বলে, 'যাহার যেমন ভাবনা—সিদ্ধিও তেমনি হইয়া থাকে।' রমেশচন্দ্র বিলাত যাইবার জন্য যখন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন—তখন ভগবান যেন তাহার সুযোগ করিয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই দুই জন দেশমান্য ব্যক্তিও সেই সময় বিলাত যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। তাঁহারাও ভাল ছেলে—রমেশচন্দ্রের বন্ধু। তিন জনেই গৌরবের সহিত এফ্. এ. পাশ করিয়াছেন—তিন জনেই বি. এ. পড়িতেছেন—তিন জনেরই বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রতিভার কথা লইয়া শিক্ষকগণ সুখ্যাতি করিয়া থাকেন।

তিন জনে পরস্পরের কাছে আপন আপন মনের কথা ব্যক্ত

করিলেন, তিন জনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এখানকার পড়া শেষ হইলেই—যেমন করিয়া হউক—বিলাতে গিয়া 'সিবিল-সার্ব্বিস্' পরীক্ষা দিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে তিন জনেই সেই সময় হইতে অতি গোপনে গোপনে সকল প্রকার জোগাড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

বাড়ীতে সকলেরই অভিভাবক আছেন—তাঁহারা যদি বিলাত যাইবার কথা ঘূণাক্ষরেও জানিতে পারেন, তবে তো কিছুতেই যাইতে দিবেন না। তখনকার দিনে বিলাত যাওয়া এখনকার মত সহজ-সাধ্য ছিল না—যে দুই চার জন কদাচ কখনো যাইতেন—দেশের লোকে তাঁহাদের আশা-ভরসা একেবারে ছাড়িয়া দিত। সুতরাং এই বন্ধু তিন জনের বিলাত যাইবার কথা শুনিতে পাইলে বাড়ীর লোক কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে চাহিবে না। আর যদি তাহাই ঘটে, তবে তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা-লাভের পথে চিরকালের জন্য কাঁটা পড়িবে। আর যে কখনও তাঁহারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা মাত্র নাই।

সুতরাং তিন জনেই অতি গোপনে গোপনে বিলাত যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের মনের কথা তাঁহারা ভিন্ন আর অন্য বন্ধু-বান্ধবেরা পর্য্যন্ত জানিতে পারিল না। অবশেষে আরো দুই বছর কাল প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়া এখানকার শিক্ষা শেষ করার পর রমেশচন্দ্র ইংরাজী ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধুদ্বয়ের সহিত কলিকাতা ছাড়িয়া বিলাত যাত্রা করিলেন।

তিন জনেই নব যুবক--তিন জনেই সংসারের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, বিশেষতঃ রমেশচন্দ্র আবার সকলের ছোট। তিন জনেই একমাত্র উচ্চ আশা বুকে ধরিয়া--দেশের গৃহের সুখশান্তির, ভোগ-বিলাসের বাসনা দূর করিয়া—সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সহায়-সম্বল-বন্ধু-বান্ধব-হীন

সুদূর বিলাত গমন জন্য জাহাজে উঠিয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিলেন। ধন্য বিদ্যার্জ্জনের স্পৃহা! ধন্য ঐকান্তিকতা! ধন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তখনকার দিনে বিলাত গমন যেমন কঠিন ছিল—তাহাপেক্ষাও কঠিন ব্যাপার ছিল—সেখানে গিয়া "সিবিল-সার্ব্বিস" পরীক্ষা দিয়া পাশ হওয়া। ইতিপূর্ব্বে একমাত্র শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন ভারতবাসী আর কোন জাতির কোন ছাত্র সে পরীক্ষা দিতে যাইতে সাহস করেন নাই। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভারতবাসী—বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর মুখোজ্জ্বল করিয়া 'সিবিল-সার্ব্বিস' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসার পর—এই প্রথম বন্ধু তিন জন সেই পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

একে তো বিলাত সাত সমুদ্র পারে সুদূরে অবস্থিত। সেখানে ভিন্ন জাতি, ভিন্ন আচার-ব্যবহার—সকলই এদেশ হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিভিন্ন। অভিভাবক নাই—আত্মীয় স্বজন নাই—বন্ধু-বান্ধব নাই—একটা 'আহা' বলিবারও কেউ নাই। তা'র উপর "সিবিল-সার্ব্বিস" পরীক্ষা!

এই 'সিবিল-সার্ব্বিস' পরীক্ষার মত কঠিন পরীক্ষা আর দু'টি নাই। বিলাতের যত ভাল ভাল ছাত্র আগে স্কুল-কলেজের সমস্ত পড়াশুনায় উত্তমরূপে পাশ হইয়া, কৃতবিদ্য পণ্ডিত হইয়া—শেষে এই "সিবিল-সার্ব্বিস" পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। খুব ভাল ছেলে না হইলে সাধারণ ছাত্রবৃন্দ এ পরীক্ষার ধারেও ঘেঁসিতে পারে না—এমনই কঠোর এই "সিবিল-সার্ব্বিস" পরীক্ষা!

এই পরীক্ষা একমাস ধরিয়া দিতে হয়। বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা হয়। প্রত্যেক বিষয়েই একটা খুব বেশীরকম নির্দ্দিষ্ট নম্বর রাখিতে পারিলে, তবে মাত্র সেই বিষয়ে পাশ হয়। তারপর প্রত্যেক বিষয়গুলিতে সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট নম্বর পাইয়া পাশ করিয়া যাইতে পারিলে, শেষে সেই সব বিভিন্ন বিষয়ের নম্বরগুলি একসঙ্গে যোগ করা হয়। এইরূপে যোগ করার পর যাঁহাদের নম্বর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে, কেবল তাঁহারাই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

কারণ প্রতি বৎসর কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা মাত্র পাশ করা হইয়া থাকে—ইহাই হইল আরও বিষম ব্যাপার। সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার পরে, সকল বিষয়ে পাশ হইয়া গেলেও সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

হয়ত পাঁচ শত ছাত্র পরীক্ষা দিতেছে, কিন্তু পাশ করিবে মোটে পঞ্চাশ জনকে। সুতরাং প্রতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলিতে পাশ করিবার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যে নম্বর আছে তার চেয়েও ঢের বেশী নম্বর রাখিয়া যাইতে পারিলে—তবে, সকল নম্বর যোগ করিয়া হয়ত সে সেই পঞ্চাশ জনের ভিতরে একজন দাঁড়াইতে পারে—নইলে আর কোন আশাই থাকে না। এইরূপে কেহ যদি প্রত্যেক বিষয়টিতে খুব বেশী রকম নম্বর না রাখিতে পারে, কিম্বা মাত্র নির্দ্দিষ্ট নম্বর রাখে, কিম্বা কোন একটা বিষয়ে ফেল হইয়া যায়—তাহা হইলে, আর কিছুতেই তাহার পাশ হইবার আশা থাকে না। কারণ সর্ব্বোচ্চ নম্বর অনুসারে মাত্র কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে পাশ করা হইয়া থাকে। কাজেই শিক্ষাবিভাগে যত প্রকারের পরীক্ষা আছে—সব চেয়ে কঠোর পরীক্ষা এই "সিবিল-সার্ব্বিস"!

ভারতবাসী তিনটি বাঙ্গালী যুবক বিলাতে গিয়া সেই মহাকঠোর "সিবিল-সার্ব্বিস" পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সকলেই

বাড়ীর লোকের অনিচ্ছায় তাঁহাদিগকে না জানাইয়া—কেবলমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া এই অনিশ্চিত বিপদসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। যদি কৃতকার্য্য না হইতে পারেন, তবে আর দেশে ফিরিয়া বিদ্রূপ ও টিটকারির জ্বালায় লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবেন না! সে কথা এখন ভাবিতে গেলেও ভয়ে তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া যায়, প্রাণ থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। কে জানে—যদি ভাগ্যদোষে "সিবিল-সার্ব্বিসে" পাশ না হইতে পারেন, তাহা হইলে হয়ত ইহ জন্মে দেশের মুখদেখা আর তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। কেমন করিয়া লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হইবার জন্য কালামুখ লইয়া আবার দেশে ফিরিয়া যাইবেন?

কিন্তু তবু তিন জনের কেহই এক বিন্দুও বিচলিত হইলেন না। বিশেষতঃ পরীক্ষার কঠোরতার বিষয় রমেশচন্দ্র মনে মনে যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনের প্রতিজ্ঞা ততই আরও দৃঢ়তর হইতে লাগিল—উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায় আরও বাড়িতে লাগিল, কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিও যেন কোন মন্ত্রবলে চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল।

রমেশচন্দ্র অসীম অধ্যবসায়ের সহিত অক্লান্ত পরিশ্রমে আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ভুলিয়া দিবারাত্রি কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এই মন্ত্র হইল তাঁহার একমাত্র জপ-মালা। প্রত্যহ চৌদ্দ পনেরো ঘণ্টা সমভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে খাটিয়া তিনি উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

বাঙ্গালী যুবকের এইরূপ পরিশ্রম করিবার শক্তি দেখিয়া, বিদ্যার্জ্জনে এমন প্রবল অনুরাগ দেখিয়া, জীবনের উন্নতির জন্য এরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ এবং কঠোর সাধনা দেখিয়া, বিদেশী পণ্ডিতগণ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—এ জাতি মনে করিলে সকল কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

তাঁহারা তিন জনেই লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যথানিয়মে প্রত্যহ কলেজের সময়ে পড়িয়া ছুটী হইলে এবং অন্য অবসরকালে সর্ব্বদাই অধ্যাপকদের নিকটে গিয়া শিক্ষালাভ করিতেন। ভারতবাসী যুবক তিন জনের পড়াশুনায় এ প্রকার আগ্রহ ও অনুরাগ দেখিয়া অধ্যাপকেরাও পরম হৃষ্টমনে তাঁহা-দিগকে সর্ব্বদাই শিক্ষা দিতেন—উৎসাহ দিতেন—নানা সদুপদেশ দিতেন। গুণের আদর সর্ব্বত্র। তাঁহারা যুবক তিন জনের গুণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। ইহা বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে কম সৌভাগ্য—কম গৌরবের কথা নহে। রমেশচন্দ্র সেই সময়ে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, জীবনে বোধ হয় তেমন কঠোর পরিশ্রম আর কখনও করেন নাই।

এইরূপে এক বৎসর ক্রমাগত মহা কঠোর পরিশ্রমে সাধনা করিবার পর, অবশেষে ইংরাজী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল।

সে বৎসর তিন শত জনেরও অধিক পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সকলেই কৃতবিদ্য, সকলেই পণ্ডিত। কেহ কেম্ব্রিজ, কেহ লণ্ডন, কেহ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গৌরবের সহিত পাশ করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের ভিতর হইতে কেবল মাত্র পঞ্চাশ জনকে পাশ করা হইবে। সুতরাং ব্যাপার যে কিরূপ গুরুতর হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

রমেশচন্দ্র পরীক্ষা দিবার জন্য পাঁচটি বিষয় ইচ্ছামত লইয়া-ছিলেন। প্রথম—ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও রচনা, দ্বিতীয়—গণিত; তৃতীয়—মনোবিজ্ঞান; চতুর্থ—প্রাকৃতিকবিজ্ঞান; পঞ্চম—সংস্কৃত।

পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সকল ছাত্রই—ইংরাজ; ইংরাজী তাঁহাদের মাতৃভাষা। কিন্তু পরীক্ষার পরে যখন ইংরাজীর ফল বাহির

হইল, তখন সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, বিদেশী বাঙ্গালী যুবক রমেশচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস এবং রচনার পরীক্ষায় তিন শত পঁচিশ জন ইউরোপীয় ছাত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মোট ৫০০ পাঁচ শত নম্বরের ৪২০ চারিশত কুড়ি নম্বর পাইয়া একেবারে দ্বিতীয় দাঁড়াইয়াছেন।

তারপর সংস্কৃত। সংস্কৃত পরীক্ষায় মোট নম্বর ৫০০ পাঁচ শত। এই পাঁচ শত নম্বরের ভিতরে রমেশচন্দ্র ৪৩০ চারিশত ত্রিশ নম্বর পাইলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মনে একটা বিশেষ ভয়ের কারণ জন্মিল।

সাহেব ছাত্রগণ সংস্কৃত-শাস্ত্রে নম্বর কম বলিয়াই হউক—কি কঠিন বলিয়াই হউক—কি যে কারণেই হউক, কেহই পরীক্ষা দিবার জন্য সংস্কৃত লন না। তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় পরীক্ষা দেন। ঐ ভাষাতে পূর্ণ নম্বর থাকে ১৫০০ দেড় হাজার। সুতরাং অন্য বিষয়ে এ দেশের ছাত্রগণ যতই বেশী নম্বর রাখুন না কেন—লাটিন ও গ্রীকে ইউরোপীয় ছাত্রগণ যথেষ্ট নম্বর পাইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার নম্বরের সমষ্টি যোগের সময় তাহাদিগের উপরে উঠিয়া যান।

কিন্তু রমেশচন্দ্রের মনে যতই ভয় হউক না কেন, তিনি যে প্রকার ঐকান্তিক মনপ্রাণের সহিত কঠোর সাধনা করিয়াছেন, তাহার ফল যাইবে কোথায়? তিনি ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও রচনা এবং অন্যান্য বিষয়গুলিতেও এত বেশী নম্বর রাখিলেন যে, ইউরোপীয় ছাত্রগণ লাটিন গ্রীকে সংস্কৃতের চেয়ে চতুর্গুণ বেশী নম্বর রাখিয়াও তাঁহাকে হারাইতে পারিলেন না। বরং একমাস পরে যখন সর্ব্বশেষে পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তখন দেশশুদ্ধ লোক দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন যে, বাঙ্গালী যুবক রমেশচন্দ্র মহাকঠোর সিবিল-সার্ব্বিসের

প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় একেবারে সকলকে ছাড়াইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পাশ হইয়াছেন।

বিহারীলাল এবং সুরেন্দ্রনাথও সিবিল-সার্ব্বিসে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন বন্ধু তিন জনের আর আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"সিবিল-সার্ব্বিস্" পরীক্ষায় পাশ হওয়ার পরেও আরও কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা দিয়া তবে তাহা শেষ হয়, তখন তাঁহারা রাজকার্য্যের শিক্ষা-নবিসি করিবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। সুতরাং পাশ হইবার পরেও রমেশচন্দ্র সেই সকল বিষয় অধ্যয়ন এবং শিক্ষা করিবার জন্য পরিশ্রমের ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার অর্থেরও যেমন স্বচ্ছলতা ছিল না—সময়ের অভাবও তেমনি। তথাপি তিনি যখন যেমন অবসর পাইতে লাগিলেন, তখন তেমনি যথাসাধ্য ইংলণ্ডের নানা স্থান বেড়াইয়া নানা ঐতিহাসিক স্মৃতি—বীরত্বের স্মৃতি—আত্মত্যাগের স্মৃতি প্রভৃতি জড়িত দেশ ও বস্তু সকল দেখিয়া লইলেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার দেশ-ভ্রমণের এবং অভিজ্ঞতা উপার্জ্জনের বাসনা বড়ই প্রবল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক বিবরণ সকল জানিবার, দেখিবার, শিখিবার এবং আলোচনা করিবার বড়ই আগ্রহ। সুতরাং সেই সকল স্থান দেখিয়া বেড়াইয়া দিন দিন তাঁহার চিন্তাশীল চিত্তের প্রতিভা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন যে দেশের যে স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন—তখন সেখানকার সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিতে এবং জানিতে পারিলেন, সকলই লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সব বিবরণ পাঠ করিলেও ঘরে

বসিয়া এ দেশের লোক বিস্তর অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এইরূপে পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তিনি ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি নানা দেশের নানা স্থান যথাসাধ্য দেখিয়া শুনিয়া সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন।

অবশেষে "সিবিল-সার্ব্বিস্" সংক্রান্ত যতগুলি পরীক্ষা হইয়া থাকে, ইংরাজী ১৮৭১ সনের জুলাই মাসের ৫ই তারিখে তাহার শেষ ফল বাহির হইল। তাহাতেও উত্তীর্ণ পঞ্চাশ জনের ভিতরে রমেশচন্দ্র সেই দ্বিতীয় স্থানই অধিকার করিয়া রহিলেন। এইবারে তাঁহাদের দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় হইল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে রমেশচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম আলিপুরের এ্যাসিটান্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া অক্টোবর মাসে বন্ধু দুই জনের সহিত আবার দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু আলিপুরে তাঁহাকে বেশী দিন থাকতে হইল না। বৎসর-খানেকের মধ্যেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর তিনি মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইয়া গেলেন এবং মাসকতক পরেই আবার বন-গ্রামে বদলি হইলেন। বনগ্রামে আসিয়া তিনি সেখানকার স্কুল-পাঠশালা-গুলির বিশেষ উন্নতি-সাধন করিলেন। তারপর আবার ১৮৭২ সালের ১৮ই মে মেহেরপুরে বদলি হইয়া গেলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সে অঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইল, সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ-দমনের জন্য রমেশচন্দ্র প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া দেশের লোকের কাছে যেমন ভক্তিভাজন হইয়া উঠিলেন, গবর্ণমেণ্টেরও তেমনি প্রিয়পাত্র হইয়া প্রশংসা লাভ করিলেন।

কিন্তু এই সময়ে তখনকার নীলকর সাহেবদের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর ঘটিল—তাহাতে তাঁহার উন্নতির পথে বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা

উপস্থিত হইল। কিন্তু তবুও তাহা অগ্রাহ্য করিয়া মহাপুরুষ রমেশচন্দ্র দেশের লোকের হিতসাধন কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

সেখানকার দুর্ভিক্ষ দমন হইলে তিনি আবার বনগ্রামে আসিলেন। কিছুদিন পরেই দক্ষিণ সাবাজপুরে ভয়ানক বন্যা হইয়া দেশ ছারখার করিয়া দিল, তার উপর ভয়ানক মহামারি এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিল—তখন রমেশচন্দ্র সেই খানে প্রেরিত হইলেন।

জলপ্লাবন, মহামারি এবং দুর্ভিক্ষে দক্ষিণ সাবাজপুরের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা রমেশচন্দ্রের 'ভারত-ভ্রমণ' পুস্তকে বর্ণিত আছে। সে বিবরণ পাঠ করিলে অতি বড় পাষাণেরও চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হয়—সমস্ত ব্যাপারই যেন মিথ্যা—কবি-কল্পনা বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ বঙ্গদেশে সেরূপ প্রলয়কাণ্ড আর কখনও কোথাও ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ।

সেই নিদারুণ কালে ভীষণ দুর্দ্দৈবের সময় রমেশচন্দ্র সেই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন ভীষণ যুদ্ধশেষের রণক্ষেত্রে অথবা কোন পৈশাচিক মহাশ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন প্রতি পদে পদে তাঁহার নিজেরই প্রাণসংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল। তথাপি তিনি অকুতোভয়ে দিবারাত্রি সমভাবে কঠোর শ্রমস্বীকার করিয়া বিপন্ন প্রজাবর্গের উদ্ধারের জন্য আপন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিলেন। তাহার ফলে দেশ রক্ষা পাইল—প্রজা রক্ষা পাইল। রমেশচন্দ্রকে নর-দেবতা ভাবিয়া আবালবৃদ্ধ-বনিতা ভক্তিভরে তাঁহার যশোগান করিতে আরম্ভ করিল।

ইহার পরে ত্রিপুরা, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়া অবশেষে ইংরাজী ১৮৮১ সালে রমেশচন্দ্র তিন মাসের জন্য বাঁকুড়ার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন। তারপর

পুনরায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিন মাসের জন্য বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হইলেন।

বাঙ্গালীর এইরূপ পদোন্নতি দেখিয়া, বাঙ্গালীকে একেবারে একটা জেলার হর্ত্তাকর্ত্তা হইতে দেখিয়া তখনকার কয়েকখানি ইংরাজী সংবাদপত্র বড়ই আপত্তি তুলিয়া বাধা দিবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু দত্তমহাশয় বালেশ্বরে এরূপ কার্য্যদক্ষতা, ন্যায়পরতা এবং বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিলেন যে, বাঙ্গালী-বিদ্বেষী ইংরাজী সংবাদপত্রসকলের মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল; বরং তখনকার 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' পত্রিকায় তাঁহার প্রশংসা ও কার্য্যদক্ষতার বিষয় বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইল। তাঁহার আদর্শ দেখিয়া সকলেই বুঝিল যে, বাঙ্গালী সকল প্রকার উচ্চকার্য্যই দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারে, সুতরাং রমেশচন্দ্রের গুণেই বাঙ্গালীর উন্নতির পথ মুক্ত হইয়া গেল।

সেই সময়ে এদেশে স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী স্থাপিত হইবার জন্য খুব আন্দোলন চলিতেছিল। সরকার বাহাদুর এ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি এমন উত্তর দিলেন যে, তাহা শুনিয়া সকলেই বুঝিল যে, রমেশচন্দ্র বয়সে বৃদ্ধ না হইলেও অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানে এবং রাজনীতি সম্বন্ধে পরম পণ্ডিত। তিনি যেমন নির্ভীক স্বাধীনচিত্ত—তেমনি দূরদর্শী, স্বার্থশূন্য, উদার, মহৎ-চরিত্র। এমন স্পষ্টরূপে গবর্ণমেণ্টের এবং ছোটলাট বাহাদুরের দোষগুণের আলোচনা করিলেন যে, কি দেশীয় অথবা বিদেশীয় রাজপুরুষগণ কেহই সেরূপ স্পষ্ট করিয়া মনের কথা বলিতে সাহস করিতেন না।

নিজের যতই ক্ষতি হউক—অপরের যতই বিষদৃষ্টিতে পড়ুন না কেন, সে ভয়ে রমেশচন্দ্র কখনই সত্যকথা, স্পষ্টকথা, নির্ভীকভাবে বলিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। আবার যখন যাঁহার গুণ দেখিতেন, তখন তাহা প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদ দিতে এবং প্রশংসা করিতেও ক্ষান্ত

থাকিতেন না। এইরূপে পরম ন্যায়বিচার, সত্যবাদিতা, নিরপেক্ষতা এবং দেশ-হিতৈষিতা গুণে অতি অল্পকালের মধ্যেই যুবক রমেশচন্দ্রের চরিত্র অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

কি করিলে দেশের উন্নতি হইবে—বাঙ্গালীজাতির উন্নতি হইবে—এই চিন্তাতেই রমেশচন্দ্রের মস্তিষ্ক পূর্ণ থাকিত। দেশের পূর্ব্ব গৌরব সকলের স্মৃতি তাঁহার মনে সর্ব্বদাই উজ্জ্বলভাবে জ্বলিত। যাহাতে দেশের লোকের সেই সব অতীত গৌরবের কথা মনে পড়ে, সেই সব আদর্শ সর্ব্বদা সম্মুখে দেখিয়া যাহাতে দেশের লোক আবার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রদর্শিত পথে চলিতে পারেন, পূর্ব্ব-পুরুষগণের মত মহাত্মা হইতে পারেন—আবার যাহাতে দেশ গৌরবময় হইয়া উঠে, তিনি সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা করিতেন। এবং সেই মহৎ চেষ্টাতেই, সর্ব্বদা কঠোর রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি প্রাণপণে সাহিত্য-সেবা করিতে যত্নবান হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বাল্যকাল হইতেই রমেশচন্দ্রের মনে ঐকান্তিক বাসনা যে তিনি সাহিত্য-সেবা করিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠাবান হইবেন। কারণ, তিনি ভাবিতেন যে সাহিত্য-সেবা আর জননীর সেবা এক বস্তু। ছেলে হইয়া যে মায়ের সেবা করিতে না পারিল তাহার জন্মে ধিক্—কর্ম্মে ধিক্!

সাহিত্য-চর্চ্চাতেই দেশের লোকের উন্নতি হয়, মন উদার, স্বার্থপরতাশূন্য এবং চরিত্র পবিত্র হইয়া উঠে। আর মানুষের উন্নতি হইলেই দেশের উন্নতি হইয়া থাকে। যে দেশের সাহিত্য যত উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই দেশও সেই অনুসারে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে।

কারণ, সাহিত্য মানুষের চক্ষের উপরে সর্ব্বদাই মহৎ দৃষ্টান্ত-সকল জাজ্জ্বল্যমানরূপে দেখাইয়া দেয়—অতীত গৌরবের কাহিনীসকল মনে করাইয়া দেয়; মানুষ কেমন করিয়া দেবতার মত হইতে পারে তাহার বিবরণ শুনাইতে থাকে। সেই সব বিবরণ পড়িয়া—সেই সব অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া—সেই সকল আদর্শ-পথে চলিয়া মানুষেরা দিন দিন আপনাদের চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারে। এইরূপে মানুষের আত্মোন্নতি হইলে তখন আর দেশের উন্নতি হইতে বিলম্ব ঘটে না।

কি স্বদেশে—কি বিদেশে যাঁহারা সাহিত্য-সেবা করিয়া লোক সমাজের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে যথার্থই মাতৃভূমির কাজ করিয়া, মায়ের সেবা করিয়া ধন্য হইয়া চিরকাল পূজিত হইয়া আসিতেছেন—এ ধারণা বাল্যকাল হইতেই রমেশচন্দ্রের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাই রমেশচন্দ্র এদেশের কবি ও লেখকগণকে দেবতার মত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, রাজা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে সর্ব্বদাই মনে মনে প্রণাম করিয়া পূজা করিতেন এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া যাহাতে তাঁহাদের মত হইয়া দেশের সেবা করিতে পারেন, সর্ব্বদাই সেই বাসনা মনে জাগিয়া থাকিত। এই বাসনা হইতেই তাঁহার সাহিত্য-সেবা করিবার জন্য প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছিল।

কিন্তু সাহিত্য-সেবা করা সহজ কথা নহে। সারাজীবন ধরিয়া কঠোর সাধনায় মা সরস্বতীর কৃপালাভ করিতে পারিলে, তবেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। জ্ঞানের সাগর অপার—অসীম, বিদ্যা অনন্ত—অফুরন্ত, কে কবে তাহার সীমা পাইয়াছে? তবু যে সকল মহাজন সে চেষ্টায় সারাজীবন পাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই সেই পরিমাণে ধন্য হইয়াছেন। তাই রমেশচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই কঠোর সাধনায় মা

সরস্বতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাই তিনি যৌবনেই দেশত্যাগ করিয়া, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তির আশা বিসর্জ্জন দিয়া, অভিভাবকগণের অজ্ঞাতে সুদূর বিলাত-যাত্রা করিয়াছিলেন। নহিলে তাঁহার বিলাত যাইবার অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।

এক্ষণে মায়ের কৃপায় কঠোর সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়া আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আর কি তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? সহস্র প্রকার গুরুতর দায়িত্বজনক রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহার মন সর্ব্বদা সাহিত্য-সেবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিল। তখন তিনি যখন যেটুকু অবসর পাইতে লাগিলেন—শ্রান্তি, বিশ্রাম, অবসাদ ত্যাগ করিয়া সে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে "ইউরোপে তিন বছর" নামক ইংরাজী পুস্তকে তাঁহার বিলাত-ভ্রমণের কাহিনী প্রকাশ করিলেন। সেই সময়ে এ দেশের এবং বিলাতেরও কয়েকখানি সংবাদ পত্রে সেই পুস্তকের খুব প্রশংসা প্রকাশিত হইল।

তাহার পর এদেশে আসিয়া ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে "বাঙ্গালার কৃষি-সম্প্রদায়" নাম দিয়া আর একখানি ইংরাজী পুস্তক লিখিলেন। সেই সময়ে নদীয়া ও পাবনা অঞ্চলে জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে বড়ই মনোমালিন্য ও গোলমাল চলিতেছিল। এই পুস্তকে রমেশচন্দ্র দরিদ্র প্রজাদের পক্ষ হইয়া এমন জোরের সহিত জমিদারদের এবং কর্ত্তৃপক্ষের দোষের আলোচনা করিয়াছিলেন যে, জমিদারেরা বড়ই ভয় পাইয়াছিলেন। এই পুস্তকেরও এদেশে এবং বিলাতে যথেষ্ট প্রশংসা হইয়াছিল।

এই সময় হইতেই তিনি "বঙ্গের সাহিত্য" এবং "সভ্যতার ইতিহাস" নামক পুস্তক দুইখানি লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "বঙ্গের-সাহিত্য" প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে তাঁহার নাম

দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল। এদেশের এবং বিলাতের পণ্ডিত-সমাজে পুস্তকখানি বড়ই আদরে গৃহীত হইল। বিলাতের প্রসিদ্ধ পত্রিকাসকল অত্যন্ত প্রশংসা করিল, এমন কি "পরীক্ষক" নামক একখানি বিলাতী পত্রিকা রমেশচন্দ্রের ইংরাজীতে লিখিবার ক্ষমতা দেখিয়া স্পষ্টকথায় অশেষ প্রকারে তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া ধন্য ধন্য করিল।

কিন্তু এরূপে ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য-সেবা করিয়া তাঁহার মন সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না, তিনি বুঝিলেন যে, বাঙ্গালী ইংরাজীতে যতই পণ্ডিত হউন না কেন, ইংরাজীতে যতই উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখুন না কেন, তাহাতে এ দেশের লোকের এবং মাতৃভাষার বিশেষ উপকার হইবার আশা নাই। তখন হইতে বঙ্গভাষার চর্চ্চা করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল।

একে যৌবনাবধিই তিনি মাতৃভাষার অনুরাগী—বঙ্গভাষার উপর তাঁহার বড়ই শ্রদ্ধা—তাহার উপর এই ইচ্ছা, সুতরাং তিনি তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মানুষ একান্তচিত্তে যাহা প্রার্থনা করে, ভগবান তাহাকে তাহা না দিয়া থাকিতে পারেন না—রমেশচন্দ্রেরও এই সময়ে এক সুযোগ উপস্থিত হইল।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের পিতৃবন্ধু। সে কারণেও বটে এবং তাঁহার পুস্তক সকল পড়িয়াও বটে—রমেশচন্দ্র তাঁহার প্রতি বড়ই শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি তাঁহার পরামর্শ লইবার জন্য গেলেন। এ বিষয় লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা তর্ক-বিতর্ক চলিল।

তখন বঙ্কিমবাবুর 'বঙ্গদর্শন'এর এদেশে খুব প্রতিষ্ঠা। তিনি রমেশচন্দ্রকে বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিতে উপদেশ দিলেন। তাহাতে রমেশচন্দ্র চমকিত হইয়া কহিলেন—"আমি তো বাঙ্গালা ভাষার রচনা-পদ্ধতি কিছুই জানি না—কেমন করিয়া বাঙ্গালায় লিখিব ?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন - "রচনা-পদ্ধতি আবার কি ? তুমি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি—পরম পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছ—তুমি যাহা লিখিবে তাহাই পদ্ধতি। যদি মায়ের অনুগ্রহে তোমার ভিতরে যথার্থই সে শক্তি থাকে তবে ভাবিতে হইবে না, বাঙ্গালার রচনা-পদ্ধতি আপনিই আসিবে—চেষ্টা করিয়া দেখ।"

সেই হইতেই রমেশচন্দ্রের বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবার আরম্ভ হইল। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ ই বলিয়াছিলেন যে, মায়ের অনুগ্রহে যদি যথার্থ ই শক্তি থাকে, তবে রচনা-পদ্ধতির জন্য ভাবিতে হয় না—তাহা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। রমেশচন্দ্রেরও তাহাই হইল।

তাঁহার হৃদয়ের অকপট দেশানুরাগ, মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি—এই দুই শক্তি একত্রে মিলিত হইয়া তাঁহার রচনা-শক্তি সৃষ্টি করিয়া দিল। ঐকান্তিক প্রাণের যথার্থ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পূজা কোন দেশে কোন কালে ব্যর্থ হইবার নয়।

মাতৃভূমির অতীত গৌরবের স্মৃতি তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশ-বাৎসল্যের সঙ্গে মিশিয়া কলমের মুখে যেন আপনা-আপনি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিল। প্রাচীন ভারতের কীর্ত্তিকলাপ, প্রাচীন ভারতের গৌরব-গাথা লোকের মনে জাগাইয়া তুলিবার জন্য, মাতৃভাষার উপর এবং এদেশের মহাজনগণের প্রতি লোকের শ্রদ্ধাভক্তি বাড়াইয়া দিবার জন্য তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মনে হইল যে, লেখায় তাঁহার কোন প্রকার দক্ষতা থাকুক কিম্বা না থাকুক, তাঁহার রচনার যতই নিন্দা হউক না কেন—যে উদ্দেশ্য বুকে ধরিয়া তিনি লিখিতে বসিয়াছেন, তাহার কণামাত্রও যদি সিদ্ধ হয় তাহা হইলেই তিনি ধন্য হইবেন।

হইলও তাই। যিনি এরূপ নিস্বার্থভাবে, কেবলমাত্র দেশের উপকারের জন্য যশ, মান, কীর্ত্তি, অর্থের আশা বিসর্জ্জন দিয়া দেশের

প্রতি লোকের ঘুমন্ত আকর্ষণ, ঘুমন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিতে চাহেন —তাঁহার সে আশা পূর্ণ না হইবে কেন? ভগবান যে স্বয়ং সাধকের সহায়, সে সাধনা কি কখনও ব্যর্থ হইতে পারে?

দশম পরিচ্ছেদ

তখন হইতেই আরম্ভ করিয়া রমেশচন্দ্র ক্রমে ক্রমে 'বঙ্গ-বিজেতা', 'মাধবী-কঙ্কণ', 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা' এবং 'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত' —চা'রখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলেন। তাহাতে একশত বৎসর পূর্ব্বেকার সময় পর্য্যন্ত ভারতের বিচিত্র কাহিনীসকল বর্ণনা করিলেন এবং সেই জন্য ঐ চারিখানি পুস্তক পরে এক সঙ্গে "শতবর্ষ" নাম দিয়া বাহির হইয়াছিল।

ঐ সকল পুস্তক উপন্যাস হইলেও তাহাতে প্রাচীন ভারতের রীতি-নীতি, আচার-বিচার এবং সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন প্রভৃতি বিস্তর ঐতিহাসিক ব্যাপার অত্যন্ত সুকৌশলে বর্ণিত রহিল; এমন কি বড় বড় সমালোচকেরা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন লেখকই রমেশচন্দ্রের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

শুধু যে কেবল এই চারি খানি পুস্তক লিখিয়াই রমেশচন্দ্র নিরস্ত রহিলেন তাহা নহে। রাজকার্য্যেও যেমন তাঁহার অবসর ছিল না—সাহিত্য-সেবাতেও তেমনি তাঁহার বিরাম রহিল না। তিনি ক্রমশঃ মহা কঠিন ব্যাপারের চর্চ্চায় অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

ইংরাজী ভাষার মত সংস্কৃত ভাষাতেও রমেশচন্দ্রের প্রবল অধিকার এবং মহা পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি মহা কঠিন "ঋগ্বেদের" অনুবাদ

প্রচার আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। এক জন ইংরাজী শিক্ষিত—বিলাতে পাশকরা বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেট যে সংস্কৃত ভাষায় এমন অদ্ভুত পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন—অত্যন্ত কঠোর ঋগ্‌বেদের অনুবাদ করিতেছেন—ইহা তাঁহাদের কাছে যেন স্বপ্নের কথা বলিয়া বোধ হইল। তখন চারিদিকে তাঁহার নামে যেমন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, তেমনি আবার অনেক নীচ অন্তঃকরণ ব্যক্তিগণও তাঁহার নিন্দা রটাইতে ছাড়িল না। কিন্তু রমেশচন্দ্র নিন্দা বা প্রশংসার দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একান্ত কায়মনে আপনার সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

এই কঠোর মহাশ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও তিনি কেবল মাত্র তাহা লইয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না, বঙ্গদেশের গৃহস্থজীবনের চিত্র আঁকিয়া 'সংসার' নামক পুস্তক লিখিলেন। সেই পুস্তক প্রকাশিত হইলে সকলেই পাঠ করিয়া মহা বিস্মিত হইয়া ভাবিল—"রমেশচন্দ্র কি কালিদাসের মত বাণীর বরপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? সকল দিকের সকল বিষয়েই তাঁহার লেখনী ধাবিত হইয়া অদ্ভুত ফল প্রসব করিতেছে!"

তাহার পর তিনি "প্রাচীন ভারতের সভ্যতার বৃত্তান্ত" নামে আর একখানি সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ পুস্তক লিখিলেন। লোকে যতই সর্ব্ববিষয়ে রমেশচন্দ্রের দক্ষতা, বিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা এবং জ্ঞানের প্রমাণ পাইতে এবং চাক্ষুষ দেখিতে লাগিল—ততই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া ভাবিতে লাগিল—"কে ইনি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ?"

ইহা ছাড়া "প্রাচীন ভারতের গাথা" নাম দিয়া তিনি ইংরাজীতে একখানি কাব্যগ্রন্থও লিখিলেন এবং তাঁহার 'মাধবী-কঙ্কণ' নামক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। বিলাতে এই উভয় পুস্তকেরই অত্যন্ত সুখ্যাতি রটিল—প্রত্যেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আগ্রহের

সহিত পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিলাতের পণ্ডিতগণও অশেষ সুখ্যাতি করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় এখন যে "সাহিত্য-পরিষদ" বঙ্গসাহিত্যের বিস্তর উন্নতিসাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন রমেশচন্দ্র ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সেই সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হইয়া তাহার যে উন্নতি বিধান করিয়া গিয়াছেন—এখন এসকল তাহারই সুফল মাত্র। বস্তুতই বঙ্গসাহিত্য যে রমেশচন্দ্রের কাছে কি অসীম ঋণে ঋণী হইয়া রহিয়াছে এবং থাকিবে তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

ইহা ছাড়া, রমেশচন্দ্র এ দেশের বালকগণের ভারতের পুরাবৃত্তে জ্ঞান জন্মাইয়া দিবার জন্য ইতিহাস এবং ইতিহাসমূলক কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও রচনা করিলেন। বহু স্কুলে তাহা পাঠ্য হইয়া ভারতবর্ষের নির্ব্বাপিত গৌরবের দিকে এ দেশের বালকদের দৃষ্টি আকর্ষিত করিয়া দিল।

রমেশচন্দ্র গার্হস্থ্য উপন্যাস 'সংসার' লিখিয়া যেরূপ যশ লাভ করিয়াছিলেন, পরে 'সমাজ' নামে আর একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখিয়া তাঁহার সুনাম এবং যশ আরও বাড়াইয়া তুলিলেন। তখন এমন হইল যে, তাঁহার পুস্তকপাঠের জন্য লোকে উদগ্রীব হইয়া পড়িল, কবে আবার একখানি নূতন পুস্তক বাহির হইবে তাহার আশায় ব্যগ্র হইয়া চাহিয়া থাকিতে লাগিল। ধন্য রমেশচন্দ্র!

রাজকার্য্যের জন্য দিবসে রমেশচন্দ্রের অবসর মিলিত না, তিনি উদয়াস্ত সমভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে কঠোর সরকারী কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক দেশে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য প্রাণপাত করিতেন। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে রাজকার্য্যের অন্তে যখন বিশ্রামের সময় উপস্থিত হইত, তখন তিনি সেই বিশ্রামের চিন্তা বিদায় দিয়া মায়ের পূজার ডালি সাজাইয়া বসিতেন।

ঋষি-তপস্বীরা যেমন ঐকান্তিক চিত্তে ধ্যানে নিযুক্ত হন, সন্ধ্যাকালে রমেশচন্দ্রও তেমনি ঐকান্তিক চিত্তে মহা তপস্বীর মত সমস্ত প্রাণ-মন ঢালিয়া সরস্বতীর পূজা আরম্ভ করিতেন। সেই যে তিনি লিখিতে বসিতেন, তাঁহার তখন আর অন্য ভাবনা চিন্তা থাকিত না—কোথা দিয়া যে রাত্রি হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইত—লক্ষ্য থাকিত না। এক এক দিন পাখীর ডাকে হঠাৎ চাহিয়া অবাক হইয়া দেখিতেন যে, পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়া আসিয়াছে, কোথা দিয়া যে দীর্ঘ রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেন না। তখন কয়েক মুহূর্ত্তের বিশ্রাম-জন্য তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িতেন।

এইরূপ কঠোর সাধনার ফলে তিনি বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে যাহা কিছু দান করিতে লাগিলেন—তাহাই অমূল্য—অদ্বিতীয়—তুলনারহিত হইতে লাগিল।

রমেশচন্দ্রের বাল্যাবধিই পুরাবৃত্তপাঠে একান্ত অনুরাগ ছিল, সুতরাং নিজের দেশের পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে তিনি একেবারে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাহার ফলে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে অমূল্য মণি সঞ্চিত হইল, তাহা অদ্যাবধি কোহিনুরের অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল রশ্মিতে সাহিত্য-ভাণ্ডার আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার লিখিত প্রত্যেক পুস্তকেই স্বদেশের গৌরবের কাহিনী জ্বল জ্বল করিতেছে—ইহা যে সেই মহাপুরুষের অকপট দেশানুরাগের জীবন্ত প্রমাণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

এই সকল পুস্তকলেখা ভিন্নও তিনি যে কত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কত ভাবে দেশের উপকারের জন্য কত সমালোচনা, কত গবেষণা, কত বক্তৃতা, কত কবিতা, কত চিঠী-পত্র, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। প্রকৃত তপস্বী যেমন মহাধ্যানে নিমগ্ন হইয়া,

কেবল সেই পরমার্থ চিন্তা করেন, রমেশচন্দ্রও তেমনি বীণাপাণির প্রকৃত তপস্বী, সাহিত্য ক্ষেত্রের দিকেই তাঁহার সমস্ত ধ্যান-ধারণা প্রবাহিত। বঙ্গসাহিত্যের এরূপ মহাসাধক আর দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিলেও হয়।

ধন্য রমেশচন্দ্রের মহাসাধনা!

একাদশ পরিচ্ছেদ

সাহিত্যক্ষেত্রে অক্লান্ত সাধনায় সিদ্ধ হইয়া রমেশচন্দ্র যেমন অম্লান যশ ও অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—কর্ম্মক্ষেত্রেও তেমনি যশ, কীর্ত্তি ও দেশজোড়া নাম রাখিয়া যাইতে অক্ষম হন নাই।

এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যখন তিনি সর্ব্বপ্রথমে রাজকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তখন কে ভাবিয়াছিল যে কালে এই যুবক একজন মহাকার্য্যদক্ষ, মহাপ্রতিভাশালী রাজকর্ম্মচারীরূপে দেশ-বিদেশে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাইবেন? কিন্তু যাঁহার যেরূপ সাধনা, সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার ন্যায়পরতা, তাঁহার সত্যবাদিতা, তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তা, তাঁহার পরার্থপরতা, তাঁহার মহানুভবতা, তাঁহার কার্য্যকুশলতা, তাঁহার অভিজ্ঞতাই বা পুরস্কৃত না হইবে কেন?

গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই রমেশচন্দ্রের গুণ বুঝিলেন, ক্ষমতা দেখিলেন, প্রকৃতির পরিচয় পাইলেন, তাই শতমুখে তাঁহার গুণগরিমার কথা প্রকাশ করিয়া দিন দিন তাঁহাকে উচ্চে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে ক্রমে শীঘ্রই তিনি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, পরে জেলার ভারপ্রাপ্ত সদর-ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন এবং তৎপরে বিভাগীয় কমিশনার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। এরূপ সৌভাগ্য বাঙ্গালী জীবনে আর অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল।

তাঁহার পদোন্নতির পথে কত বাধা কত বিপত্তি আসিয়াছে, কত লোকের হিংসায় বুক ফাটিয়াছে, দুর্বৃত্তগণের মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে, কত লোক কত রকমে তাঁহার বিপক্ষে হাইকোর্টে অভিযোগ পর্য্যন্ত করিয়াছে—কিন্তু তাঁহার উপর হইতে গবর্ণমেণ্টের অটল বিশ্বাস টলে নাই।

রমেশচন্দ্র পরমকর্ত্তব্যনিষ্ঠ—ন্যায়বান মহাপুরুষ, যখন যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন পূর্ব্বক দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন, দেশের লোকের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। দুষ্টগণ যমের মত তাঁহার নামে কাঁপিত, সৎব্যক্তি তাঁহাকে আপনাদের হিতৈষী বন্ধুর মত ভাবিত। যখন যে জেলা হইতে বদলি হইয়া গিয়াছেন তখনই সেই জেলায় হায় হায় রব উঠিয়াছে—কেহই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহে নাই।

কত স্থানে কত লোক তাঁহাকে ভক্তিভরা প্রাণে বিদায়-অভিনন্দন দিয়াছে, চোখের জলে বিদায়ের ক্ষণ ভাসাইয়া দিয়াছে, তাঁহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবার জন্য কায়মনে প্রার্থনা করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন—কি বড় কি ছোট—কি ইতর কি ভদ্র সকলেরই পরম হিতৈষী মিত্র হইয়া উঠিয়াছেন। যখন যে দেশে গণ্ডগোল, যখন যে দেশে বিভ্রাট, যখন যে দেশে মহামারি জলপ্লাবন দুর্ভিক্ষ—গবর্ণমেণ্টও একমাত্র উপযুক্ত বোধে রমেশচন্দ্রকে সেই খানেই পাঠাইয়াছেন, আর তাঁহার পদার্পণে সেখানে সকল বিপদ-আপদ, সকল বিভ্রাট-বিসম্বাদ ঘুচিয়া গিয়া শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। দেশের মহা-কল্যাণদায়ক এমন মহাপুরুষ বঙ্গদেশের ভাগ্যে আর কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?

এইরূপে ক্রমাগত ২৬ ছাব্বিশ বৎসরকাল রাজকার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ করিয়া রমেশচন্দ্র অবসর গ্রহণপূর্ব্বক বিলাত গমন

করেন। সেখানে গিয়া তিনি লণ্ডনের "ইউনিভার্সিটি কলেজে" ইতিহ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বেও মাঝে মাঝে বিদায়ের অবসরে আরও কয়েক বার ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

শেষবারে বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বরো রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। সেখানে কার্য্যকুশলতা এবং স্বভাবগুণে তিনি মহারাজ গাইকোয়াড়ের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উপরে রাজকার্য্যের সমস্ত গুরুভার চাপাইয়া দিয়া গাইকোয়াড় নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাকে সে কার্য্য করিতে হইল না। ইংরাজী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২টার সময়ে মহাপুরুষ রমেশচন্দ্র ইহজীবনের লীলা সাঙ্গ করিয়া পরমধামে চলিয়া গেলেন!

রমেশচন্দ্রের গার্হস্থ্যজীবন বড়ই সুখের ছিল। তাঁহার পাঁচটি কন্যা এবং এক পুত্র। চারিটি কন্যা জন্মিবার পরে পুত্র অজয়ের জন্ম হয়, তারপরে সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান সুশীলার জন্ম!

পত্নী পুত্র কন্যাগণ সকলকে জীবিত রাখিয়া পুণ্যবান রমেশচন্দ্র অমরধামে গমন করিয়াছেন। জীবনে কোনরূপ দুঃসহ শোক তাঁহার সাধনার পথে বাধা জন্মাইতে পারে নাই।

সম্পূর্ণ

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ঠাকুরমার ঝোলা

দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১।০

[বঙ্গদেশের ডিরেক্টরবাহাদুর কর্ত্তৃক লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য নির্দ্দিষ্ট।]

ঠাকুরমার মুখে শোনা সেই অতীত যুগের রূপকথা—সেই সেকেলে রাক্ষসী-ডাইনী, শুকশারী, রাজপুত্র-রাজকন্যে, পরী-জিন প্রভৃতির গল্প। অথচ প্রত্যেক গল্পেই যথেষ্ট শিক্ষার বিষয় আছে। পাতায় পাতায় ছবি। একাধারে আমোদ ও শিক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার। সুন্দর কাপড়ে মনোরম বাঁধাই। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

বিদ্যারত্ন, এম-এ বলেন—

"......শৈশবের সেই কৌতূহল, সেই উদ্দাম-কল্পনা, সেই আনন্দ-উল্লাস নাই, তথাপি রূপকথাগুলি একাগ্রচিত্তে পড়িয়াছি। আমারই যখন এই দশা, তখন না জানি এই পুস্তক শিশুচিত্তে কি আনন্দ-আলোড়ন তুলিবে।"

The Amritabazar Patrika says—"The book is an inimitable production and should take its rank among Folk Tales of Bengal and Grimm's Popular Tales"

'নায়ক' বলেন—"...বহিখানি হাতে পড়িলে সত্যই চক্ষু জুড়াইয়া যায়, আবার শিশু সাজিতে সাধ হয়।"

তিন-আনা সংস্করণ কল্পতরু গ্রন্থাবলী

১। বিদ্যাসাগর
২। মাইকেল মধুসূদন
৩। বঙ্কিমচন্দ্র
৪। রাজা রামমোহন রায়
৫। কেশবচন্দ্র
৬। ঠাকুর রামকৃষ্ণ
৭। নেপোলিয়ান
৮। রমেশচন্দ্র দত্ত
৯। রামদুলাল সরকার
১০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
১১। কৃষ্ণদাস পাল
১২। হাজি মহম্মদ মহসীন
১৩। আনন্দমোহন বসু
১৪। জর্জ্জ ওয়াসিংটন
১৫। প্যারীচরণ সরকার
১৬। লর্ড কিচ্‌নার
১৭। বিবেকানন্দ
১৮। ভূদেব
১৯। জেম্‌সেদ্‌জী টাটা
২০। গোখ্‌লে
২১। দ্বিজেন্দ্র লাল
২২। হেমচন্দ্র
২৩। ডেভিড্‌ হেয়ার
২৪। রামতনু লাহিড়ী

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।

পাটুয়াটুলী—ঢাকা।